মাশরুম চাষ

বলাই লাল জানা
ও
প্রফুল্ল কুমার দাস
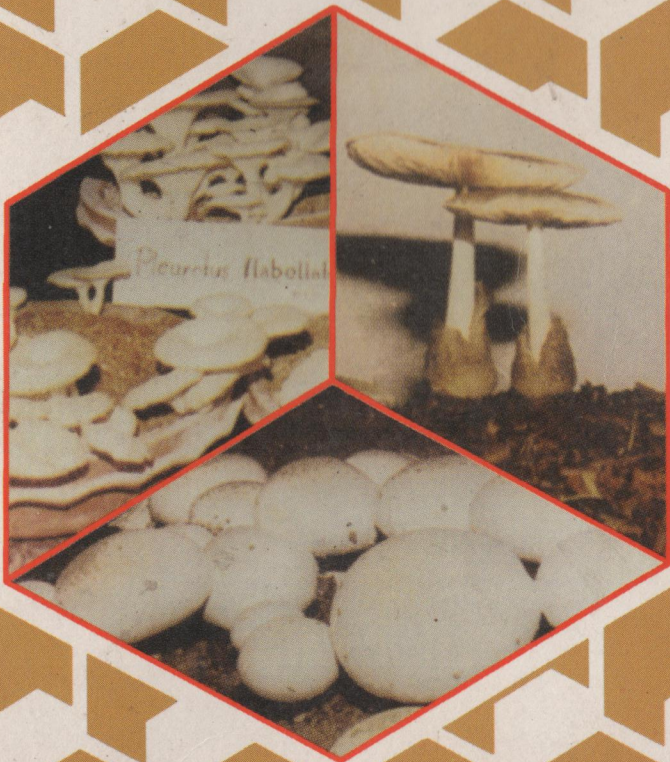
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

মুখবন্ধ

প্রাচীনকাল থেকেই মাশরুম বা 'ব্যাঙের ছাতা' একটি সস্তায় উপাদেয় প্রোটিনযুক্ত খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয়ে আসছে। ফ্রান্স, হল্যান্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশে প্রথমে গৃহের মধ্যে মাশরুম চাষবাস শুরু হয়। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে ব্যবসা-ভিত্তিকভাবে এর চাষবাস শুরু হয়। ক্রমাগত বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতি ও প্রযুক্তির উন্নয়নে মাশরুম চাষ আজ আমাদের দেশেও একটি কুটির শিল্পে পরিণত হয়েছে। 'বিকল্প প্রোটিন' হিসাবে মাশরুমের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাশরুমের পুষ্টিমান মাংস ও সবজির সংমিশ্রণ বলা যেতে পারে। ডায়েবেটিক বা বহুমূত্র রোগী তথা হার্টের রোগীদের এটি একটি সুপাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য বলে বিবেচিত। এই ফসলের কিছুটা কর্কট-বিরোধী গুণাগুণ রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন। সারা বিশ্বে মাশরুম তাই একটি অত্যন্ত সস্তায় প্রোটিনযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। দেশ-বিদেশে তথা আমাদের গ্রামাঞ্চলে আজকাল মাশরুমের চাষবাসে বেশ উৎসাহ এবং আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের রাজ্যে চুঁচুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্র, বিধানচন্দ্র কৃষিবিদ্যালয়, বনবিভাগ, আলিপুর এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অফ্ ইন্ডিয়া, নিমপীঠের বিবেকানন্দ বায়োটেকনোলজি গবেষণাগার প্রভৃতি জায়গায় মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং গবেষণার কাজ চলছে। গ্রামাঞ্চল তথা শহরে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা আজকাল দলে দলে প্রশিক্ষণ নিয়ে মাশরুম চাষে বিশেষ আগ্রহী হচ্ছেন। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও মাশরুম চাষে বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং হাতে-কলমে শিক্ষাদান করার ব্যবস্থা করছে। গ্রামাঞ্চলে তাই মাশরুম বীজের (স্পন্) চাহিদাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র চাষীরা প্রশিক্ষণ নিয়ে সহজেই ঘরে বসে লাভজনকভাবে মাশরুম চাষ করতে পারবেন। ক্ষুদ্র এবং বৃহদাকারে বাণিজ্যিকভাবে মাশরুম চাষ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বল্প অর্থ বিনিয়োগে গ্রামাঞ্চলে লাভজনকভাবে মাশরুম চাষ সম্ভব। শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরা মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে বড় আকারে মাশরুম চাষে বিশেষ আগ্রহী হচ্ছেন। মাশরুম চাষ তাই গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি বিশেষ ভূমিকা পালনে সক্ষম।

বাজারে মাশরুম চাষের জন্য বাংলায় লেখা সহজেবোধ্য বই-এর খুবই অভাব। সেজন্য লেখকদ্বয় মাশরুম চাষের প্রযুক্তি এবং গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক পুনরুত্থান সম্ভাবনার কথা ভেবে এই পুস্তকটি রচনার প্রয়াস নিয়েছেন। বিভিন্ন ইংরেজি/বাংলা বই, পত্র-পত্রিকা এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবির থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এই পুস্তকটিতে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা হয়েছে। আশা করি সাধারণ শিক্ষিত পাঠক তথা মাশরুম চাষে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে এই পুস্তকটি একটি 'গাইড বুক' বা সহায়ক পাঠ্যক্রম হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারবে। এই পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে মাশরুম চাষের তথ্যাবলী সংযোজন করার বিশেষ চেষ্টা হয়েছে। আশা করি বইটি সবার কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করবে এবং সামান্যতম কাজে লাগলেই লেখকদ্বয় তাঁদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করেন। বইটি লেখার সময় শ্রীমতী পুষ্প জানা এবং শোভা দাসের বিশেষ উৎসাহ লেখকদের প্রেরণা যুগিয়েছে।

কলকাতা
ডিসেম্বর ২০০১

বলাই লাল জানা
প্রফুল্ল কুমার দাস

সূচীপত্র

মাশরুমের বিভিন্ন চিত্রাবলী

মাশরুমের বিভিন্ন সারণী

প্রথম অধ্যায়

মাশরুম কাকে বলে?

মাশরুম হ'ল এক ধরনের ছত্রাক, চলতি কথায় ''ছাতু'' বা ''ব্যাঙের ছাতা''। প্রাচীনকাল থেকেই আদিবাসীদের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্ম নেওয়া ছাতু বা মাশরুম খাওয়ার প্রচলন ছিল। এখনো এই অভ্যাস তাদের মধ্যে রয়েছে। কোথাও কোথাও একে পাতাল ফোঁড়, ভুঁই ফোঁড়, কোঁড়ক, কুঁড়ি, ওল, চেঁও, ওত ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। 'ছাতু' বা ছত্রাক কার্যত জীবন্ত উদ্ভিদ—একটি সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর উদ্ভিদ, সাধারণ উদ্ভিদের মত নয়। এদের সবুজ কণা বা ক্লোরোফিল থাকে না। তাই এদের পুষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্য বাইরের খাদ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। সাধারণত এরা মৃত এবং পচা জৈব পদার্থের উপর বৃদ্ধিলাভ করে। এদের তাই পরভোজী উদ্ভিদ বা 'স্যাপ্রোফাইট্স' বলে। কিন্তু কতকগুলি পরভোজী এবং মিথোজীবী (Parasitic and symbiotic) ছত্রাক অন্য জীবন্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের উপরেও বৃদ্ধিলাভ করে। পৃথিবীর সবদেশেই মাশরুম সবজি হিসাবে খাওয়া হয়। এটি সহজ পাচ্য, সুস্বাদু, পুষ্টিকর এবং মুখরোচক খাদ্য।

প্রাচীনকাল থেকেই মাশরুম মানুষের খাদ্য হিসাবে চাষ ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মানব সভ্যতার শুরু থেকেই মাশরুমের চাষ ও ব্যবহারের বিস্তৃতি ঘটেছে। মানুষ যখন প্রকৃতি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে শিখল, পরবর্তীকালে সেইসব খাদ্যের চাষবাস শুরু করল। তারা মাশরুম বা 'ব্যাঙের ছাতা'কে একটি পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে জানতে পারল। যে কোনো সবজি থেকে এর খাদ্যগুণ অনেক বেশি। এতে প্রোটিন, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে আছে। প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকায় শরীরের হাড় ও দাঁতের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। নিয়াসিন ও ভিটামিন 'সি' প্রচুর পরিমাণে থাকার ফলে চর্মরোগের উপকারী।

প্রাচীন তথ্য থেকে জানা যায় যে আদিম ভারতবাসী, গ্রীক, রোমান ও অন্যান্য দেশের মানুষ মাশরুম কি তা জানতো। তারা প্রাচীন দেব-দেবীদের এ দিয়ে অর্ঘ্য বা পূজা দিত। এমনকি তারা রাজা-মহারাজাদের মাশরুম উপঢৌকন দিত। মাশরুম চাষ নিয়ে অনেক লোককথা, গল্পগাথা এবং কুসংস্কার ছড়িয়ে আছে। এইসব ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় ঘটনাই প্রমাণ করে যে মাশরুম নিঃসন্দেহে একটি অতি প্রাচীন বা সেকেলে ফসল। মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমপ্রসারের ফলে আজ মাশরুম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন যুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে সারা বিশ্বে সুপরিচিত। ফলে প্রাকৃতিদত্ত বাসস্থান থেকে আজ মানুষের চেষ্টায় গৃহের মধ্যেই এই পুষ্টিকর বহুমূল্য মাশরুমের

চাষবাস হচ্ছে। সারা বিশ্বে মাশরুম আজ একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর উপাদেয় খাদ্য হিসাবে পরিচিত। বড় বড় হোটেলে, রেস্টুরেন্টে মাশরুমের স্যুপ এবং অন্যান্য রেসিপি বা ভোজ্যদ্রব্য আজ বহুমূল্য।

গুরুত্ব ও প্রসার

যদিও প্রাচীনকাল থেকে মাশরুম একটি উপাদেয় খাদ্য হিসাবে গুরুত্ব ও প্রসারলাভ করে আসছে, তাদের গৃহমধ্যে চাষবাস প্রথম শুরু হয় কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে—ফ্রান্স, হল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি। সময়টা বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধ। ব্যবসা ভিত্তিকভাবে এর চাষ শুরু হয় এই শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই।

ক্রমাগত বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতি এবং প্রযুক্তির উন্নয়নে মাশরুম চাষ আজ একটি কুটির শিল্পে পরিণত হয়েছে। অন্তর্দেশের অন্দর মহলে এর চাষবাস ও বাজারজাত ছাড়াও বিদেশে যেমন—হল্যান্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশগুলিতে মাশরুম রপ্তানি হচ্ছে। এর মূল কারণ হ'ল, মানুষ বুঝতে শিখেছে মাশরুম বা ছাতু বা 'ব্যাঙের ছাতা' মানুষের একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য—যা বহুমূল্য আমিষ বা প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট্স বা শর্করা, খনিজ পদার্থ এবং ভিটামিনে পরিপূর্ণ। সত্যি কথা বলতে কি, মাশরুমের পুষ্টিমান মাংস এবং সবজির সংমিশ্রণ বলা যেতে পারে। তাই একে 'সবজি মাংস' (Vegetable meat) বলা হয়। মাশরুমের তাপমান বা ক্যালোরিমূল্য কম। তাই ডায়েবেটিস বা বহুমূত্র রোগী, রক্তাল্পতা রোগী, শিশু এবং হার্টের রোগীদের এটি একটি সুপাচ্য অথচ পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে নির্বাচিত। এ ছাড়া মাশরুমে কিছু কর্কটরোগ বিরোধী (Anti-cancer) গুণাগুণ রয়েছে বলে প্রমাণিত। তাই মাশরুম এখন সারা বিশ্বে একটি অতি পুষ্টিকর খাদ্য-বিকল্প তথা বেশ কিছু রোগ-প্রতিরোধশীল খাদ্য হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে বিভিন্ন কৃষি বর্জ্য পদার্থ প্রচুর। এই বর্জ্য পদার্থই প্রধানত মাশরুম চাষের মূল উৎস। তাই আমাদের কৃষি, বন এবং বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক শিল্প ও কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ভালভাবে ব্যবহার করে মাশরুম চাষ করলে দূষণ রোধ হবে এবং এই বহুমূল্য মাশরুম চাষ বৃদ্ধি পাবে।

তৃতীয়ত, গৃহের মধ্যে মাশরুমের চাষ হওয়ার ফলে চাষবাসের ব্যবহার-অযোগ্য জমিও নষ্ট হচ্ছে না এবং ঘরের মেঝের প্রতি একক জায়গায় আর্থিক দিক দিয়ে ভালভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্য যে কোনো চাষবাস অপেক্ষা তাই মাশরুম চাষ খুবই লাভজনক এবং আর্থিক সুবিধাযুক্ত। নিম্ন আয়কারী প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকরা সহজেই এর চাষবাস ঘরে বসেই লাভজনকভাবে করতে পারেন। পরন্তু স্বল্প বিনিয়োগে তাড়াতাড়ি মাশরুমের চাষে লাভজনকভাবে ফসল পাওয়া যায়। মাশরুম তাই সস্তায় প্রোটিনের চাহিদা মিটিয়ে অপুষ্টি থেকে রক্ষা করে।

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষে মাশরুমের চাষ ক্রমশ

জনপ্রিয় হচ্ছে। এখানে অধিকাংশ দেশবাসীরা যেখানে অপুষ্টি এবং প্রোটিন খাদ্যের অভাবে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন, মাশরুম চাষের গুরুত্ব তাই অনেক বেশি, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। ভারতের বহুমুখী কৃষি-জলবায়ু পরিবেশে বিভিন্ন জাতের ভোজ্য মাশরুমের চাষ এখানে বিশেষ উপযোগী। ভারত মূলত কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষি-নির্ভর। মাশরুম চাষের কাঁচামাল হিসাবে কম্পোস্টের প্রাচুর্য এখানে অনেক। এছাড়া এখানকার সস্তায় শ্রম মাশরুম চাষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্রাকারে মাশরুম চাষের পরিকাঠামো খরচও কম। ফলে ভারতের গ্রামাঞ্চলে সত্তরভাগ বসবাসকারী দরিদ্র, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা সহজেই মাশরুম চাষে সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারেন। এ ছাড়া গ্রামীণ মহিলারা মাশরুম চাষকে অবসরের জীবিকা হিসাবে সহজেই গ্রহণ করতে সক্ষম এবং এতে অতিরিক্ত আয় বৃদ্ধি হবে ও খাদ্য হিসাবে মাশরুম ব্যবহারে পরিবারের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা (WHO) এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে মাশরুম চাষকে প্রোটিন বিকল্প খাদ্য হিসাবে অগ্রাধিকার দিয়েছে। বিদেশে মাশরুম রপ্তানির যথেষ্ট সুযোগ বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর চাষবাস শুরুও হয়েছে। এইসব সুযোগ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন রাজ্যে, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মাশরুম চাষের উপর ভারত সরকার দ্রুত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, বিভিন্ন প্রজাতির মাশরুম চাষের প্রযুক্তি প্রসারের ব্যবস্থা নিয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী স্তরে মাশরুম চাষে আজ বহুমুখী প্রকল্পের বিস্তার ঘটছে।

মাশরুম চাষের ইতিহাস

প্রাগৈতিহাসিক যুগেও মাশরুম চাষ জানা ছিল, এমন কি এই পৃথিবীতে মানুষের বসবাস শুরুর আগেও মাশরুম বা ছত্রাকের সন্ধান পাওয়া যায়। বেদ এবং অনেক প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থে মাশরুম ব্যবহারের পরিচয় মেলে। মিশরের ফারাওদের কাছেও মাশরুম খুব প্রিয় খাবার ছিল। গ্রীক রোমানরা একে ভগবানের আহার বলতো। ২০৩ খ্রীষ্টপূর্বে প্রাচীন চীনা সাহিত্যে 'জিউ-এর কান-ছাতু' (Jew's ear mushroom–Auricularia spp.) চাষের বিবরণ পাওয়া যায়। চীনা এবং জাপানিরা বিগত ২০০০ বছর ধরে Lentinus edodes (ল্যান্টিনাস্ ইডোডেস্) এবং Volveriella volvacea (পোয়াল ছাতু) চাষ করে আসছে বলে জানা যায়। ফ্রান্সে ৭০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বোতাম ছাতুর (Agaricus bisporus) চাষ হয় বলে জানা গেছে। বোতাম ছাতু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সর্বাধিক চাষ হয়।

মাশরুম চাষের জ্ঞান এবং প্রাচীন কলা সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য জানা গেলেও, এটা ঠিক যে এর বাণিজ্যিক চাষবাস শুরু হতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের তরমুজ চাষীরা প্রথম বোতাম ছাতুর চাষ শুরু করে তরমুজ ফসলের কম্পোস্ট ব্যবহার করে। তারপর থেকে এর চাষবাস অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে বিস্তার লাভ করে। বিশেষ করে হল্যান্ড, স্পেন এবং ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রে। আমেরিকায় বোতাম ছাতুর চাষ

শুরু হয় ১৮৯০ সালের কাছাকাছি। ১৯১০ সালে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামোয় বোতাম ছাতুর চাষ শুরু হয় নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বাতাস চলাচল ব্যবস্থাযুক্ত স্থানে। সারা বছর ধরেই এই নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় বোতাম ছাতুর চাষ করা সম্ভব হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্রুত উন্নতি এবং প্রসারে মাশরুম চাষের বিভিন্ন দিগন্ত খুলে গেছে, যেমন—উচ্চমানের স্পন্ তৈরি, উন্নতমানের কম্পোস্ট তৈরি, কেসিং বা আবরণ, ইত্যাদির ফলে মাশরুমের ফলন এবং গুণমান আজ উন্নত দেশগুলিতেও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে—বিশেষ করে ইউরোপ, জাপান, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, ইতালী, জার্মান, চীন, কোরিয়া ইত্যাদি দেশে। সারা বিশ্বে বোতাম ছাতুর চাষবাসে সর্বাধিক উন্নতি, যান্ত্রিকীকরণ চালু হওয়ার ফলে মাশরুমের একটা বিশাল বাজার আজ তৈরি হয়েছে এবং নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় এর প্রসার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বোতাম ছাতু চাষের উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি এবং নির্দেশিকা নিয়ে অন্যান্য মাশরুম চাষেও আজ প্রভূত উন্নতি ঘটেছে—বিশেষ করে ধিংড়ি ছাতু (Oyster), পোয়াল ছাতু (Paddy-straw) ইত্যাদির উন্নতি বিগত ষাট দশক থেকে শুরু হয়ে আজ অনেক উঁচুতে উঠছে। মোট মাশরুম উৎপাদনে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এইসব ছাতুর উৎপাদন পরিমাণও নেহাত কম নয়। তা সত্ত্বেও **বোতাম ছাতুর চাষ এবং উৎপাদন হার সারা বিশ্বে সব থেকে বেশি এবং চাষ খুবই খরচ বহুল।** সারা বিশ্বে ১৯৮৩ সালে মোট মাশরুম উৎপাদন ১.৩৬ মিলিয়ন টনের মধ্যে কেবলমাত্র বোতাম ছাতুর উৎপাদনই ছিল ৯,৪০,০০০ টন—প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ। ১৯৮৬ সালে বোতাম ছাতুর পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় শতকরা ৫৬ ভাগ, অর্থাৎ ১.২৩ মিলিয়ন টন। বিভিন্ন প্রজাতির মাশরুমের উৎপাদন ছিল ২.১৮ মিলিয়ন টন। যাইহোক, অন্যান্য আরো কয়েকটি বাণিজ্যিক ভোজ্য মাশরুমের চাষের প্রচলন হওয়ায় বোতাম ছাতুর চাষ এখন প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ (সারা বিশ্বে মোট বিভিন্ন প্রজাতির মাশরুমের উৎপাদনের মধ্যে)।

ভারতের মাশরুম চাষের প্রসার

ভারতের প্রাচীন ভেষজ বিদ্যায় বিভিন্ন প্রকার মাশরুমের ব্যবহারে রোগ সারানোর কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বে মনুসংহিতায় সে বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। তখনকার দিনে গ্রামের মানুষরা, প্রধানত ভারতের উপজাতিদের মধ্যে বেশ কিছু প্রাকৃতিক ভোজ্য মাশরুমের চিরাচরিত ব্যবহারের কথা জানা যায়। আমাদের দেশে মাশরুমের বাণিজ্যিক চাষবাস খুব বেশি দিনের নয়। অতি সম্প্রতি মাশরুম চাষের প্রসার ও উন্নতি ঘটেছে।

যাইহোক, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এ ডব্লিউ নিউটন কিছু ভাল প্রজাতির মাশরুম চাষ এখানে শুরু করেন এবং এগুলি এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অফ্ ইন্ডিয়ার বার্ষিক প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। ১৯২১ সালে এস আর বোস সম্পৃক্ত গোবরের মধ্যে দুটি বোতাম ছাতুর চাষবাসে কৃতকার্য হয়েছিলেন।

১৯৩৯ সালে মাদ্রাজ সরকারের (তামিলনাড়ু) কৃষি বিভাগ **প্রথম পোয়াল ছাতুর (Paddy-straw mushroom) চাষবাস** নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে। পরে কিছু উন্নতিবিধানের পর পোয়াল ছাতু ছাড়াও ধিংড়ি ছাতুর (Oyster mushroom) চাষ দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। বোতাম ছাতুর (Button mushroom) চাষ ভারতে প্রথম শুরু হয় ১৯৬১ সালে হিমাচল প্রদেশের সোলানে। হিমাচল প্রদেশ রাজ্য সরকার নয়া দিল্লির ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের (ICAR) সহায়তায় সোলানে মাশরুম চাষের উন্নয়ন প্রকল্পের ('Development of Mushroom Cultivation in Himachal Pradesh') কাজ শুরু করে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন প্রকার মাশরুম চাষে গবেষণা ও উন্নয়ন মূলক কাজকর্ম এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মাশরুম চাষের বিস্তার ঘটানো। এই কাজে আন্তর্জাতিক মাশরুম বিশেষজ্ঞদের পরিষেবা কাজে লাগানো হয়। ফলে ১৯৬৪ সালে এই প্রকল্প খুবই কার্যকরী হয়, বিশেষ করে ঘোড়াসারের কম্পোস্ট এবং গমের খড়ের সঙ্গে কিছু কৃত্রিম রাসায়নিক দ্রব্যাদির মিশ্রণে মাশরুমের চাষে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। এই প্রকল্পে ফাও/ ইউ. এন. ডি. পির (FAO / UNDP) সাহায্যের ফলে মাশরুম চাষে এবং পাস্তুরাইজ করা কম্পোস্ট তৈরির উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ চালু করা হয়। বিশেষ কৃতকার্যতার ফলে সোলানের এই মূল প্রকল্প আরো বড় আকার ধারণ করে এবং "আই. সি. এ. আর সমন্বয় মাশরুম গবেষণা প্রকল্পে' (ICAR Co-ordinated Mushroom Research Scheme) উন্নীত হয়। নয়া দিল্লি, লুধিয়ানা এবং বাঙ্গালোরে এই প্রকল্পের তিনটি শাখা স্থাপিত হয়। পরে এই প্রকল্পের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে বাণিজ্যিক চাষবাস প্রসারিত হয় নয়া দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, উত্তরপ্রদেশ, নীলগিরি, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে।

১৯৮২ সালে আই. সি. এ. আর কর্তৃক ষষ্ঠ পরিকল্পনা কালে সোলানে (হিমাচল প্রদেশ) **"জাতীয় মাশরুম গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র"** (The National Centre for Mushroom Research and Training) স্থাপিত হয়। এটিই বর্তমানে ভারতে প্রথম এবং প্রধান মাশরুম চাষ ও প্রশিক্ষণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এছাড়া কয়েকটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে—পাঞ্জাব, লুধিয়ানা, জি. বি. পন্থ, সি. এস. আজাদ, তামিলনাড়ু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে মাশরুম চাষের উপর বিভিন্ন গবেষণা ও প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ভারত সরকারের সম্প্রসারণ ডাইরেক্টরেট বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি ও সম্প্রসারণ বিভাগের মাধ্যমে মাশরুম চাষের সম্প্রসারণ কর্মসূচী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের তথা সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মধ্যে বিস্তার ঘটানোর কাজে শামিল হয়।

আধুনা মাশরুম চাষের পরিকাঠামো উন্নয়নে অনেক কাজকর্ম হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বিভাগ এখন মাশরুম চাষে বিভিন্ন অনুদান প্ল্যানিং কমিশন থেকে প্রাপ্ত হয়ে জাতীয় হর্টিকালচার বোর্ডের (National Horticulture Board or NHB) মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি/হর্টিকালচার ডাইরেক্টরেট বা সমভাবাপন্ন

সংস্থার মাধ্যমে মাশরুম চাষের স্পন্ তৈরি বিভাগ, পাস্তুরাইজ কম্পোস্ট তৈরি বিভাগ, ইত্যাদি তৈরি করেছে।

সরকারী বিভাগ ছাড়াও অনেক প্রাইভেট ফার্ম/সংস্থা, অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি, প্রভৃতি মাশরুম চাষে শিল্পভিত্তিক প্রসার ঘটানোর কাজে নিয়োজিত হয়েছে। নিজস্ব চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে মাশরুম চাষে এখন বহুমুখী প্রকল্প চালু হয়েছে। এ ব্যাপারে টাটা চা, পন্ডস্ ইন্ডিয়া, ফ্লেক্স ইত্যাদি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। এপিডা (The Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority বা সংক্ষেপে APEDA) ভারতের বাণিজ্যিক মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাইভেট সংস্থাগুলিকে মাশরুম চাষের বহুমুখী উৎসাহ প্রদান, পরিকাঠামো ব্যবস্থার উন্নতি, বাজারজাত করা, চাহিদা নির্ণয়, ইত্যাদি বিষয়ে মাশরুম শিল্পে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

বোতাম ছাতু চাষ ছাড়াও, মধ্য-দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং প্রায়-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় (Sub-tropical) জলবায়ু পরিবেশে ধিংড়ি ও পোয়াল ছাতু চাষে চাষীরা বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছে। ধিংড়ি ছাতু চাষের উন্নত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল প্রথমে নয়া দিল্লির আই. এ. আর, আই-তে প্রমিত করা হয় (standardised)। পরে তা তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে প্রসারিত হয়। এই চাষে সারা বছর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সম্ভাবনা থাকায় খুব সহজেই ঘরোয়া কুটির শিল্প হিসাবে দেশের সর্বত্র স্বল্প বিনিয়োগে করা সম্ভবপর। একইভাবে পোয়াল ছাতু চাষের সম্প্রসারণে কেরালা, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে প্রচুর সম্ভাবনা বর্তমান। ফলনবৃদ্ধিতে শুধু দরকার আরো ব্যাপক গবেষণা এবং উন্নত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল সম্প্রসারণ ব্যবস্থা।

গত দু'বছরে মাশরুমের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে আমাদের দেশে মাশরুমের উৎপাদন ছিল প্রায় ৪ হাজার টন। এখন এই পরিমাণ প্রায় ২৫ হাজার টন ছাড়িয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন মাশরুমের উৎপাদন প্রায় ৭০ টনের মত। ১৯৯২-৯৩ সালে এরাজ্যের উৎপাদন ছিল ৫০ টন। এরাজ্যের জলবায়ু অনুযায়ী ঝিনুক ছাতু, পোয়াল ছাতু, বোতাম ছাতু, প্রভৃতি প্রজাতির মাশরুমকে খাদ্য এবং চাষের উপযোগী বলে বেছে নেওয়া হয়েছে।

মাঝারি আকারে একটি আদর্শ মাশরুম চাষের জন্য চাষযোগ্য জমি লাগবে ৩৬০০ বর্গফুট এবং মাশরুম ফার্মের জন্য ভূমির পরিমাণ হবে ১০০০ বর্গফুট (১০০'X১০')। একটি আদর্শ মাশরুম মাচার উচ্চতা হবে ১২ ফুট। এতে ৬টি তাক থাকবে। মাটি থেকে ২ ফুট উচ্চতায় তাক তৈরি করতে হবে। এরাজ্যে সাধারণত ধানের বিচালি বা খড় ব্যবহার করা হয়। ৩-৪ ইঞ্চি মাপে ছোট ছোট করে কেটে পরিষ্কার জলে ১০ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখা হয়। ১০ কেজি ধানের বিচালি বা খড়ের জন্য বীজ বা স্পন্ লাগবে ৫ প্যাকেট। প্রতি প্যাকেটে বীজ থাকে ২০০ গ্রাম।

হিসাব করে দেখা গেছে, ৩০ বর্গফুট চাষযোগ্য জায়গায় (প্রতি তিন স্তর বিশিষ্ট

৫'X২' একটি প্রদর্শন ক্ষেত্র) স্পন সহ খড়ের বিছানা তৈরি করতে প্রায় ৪০০ টাকা খরচ লাগে। প্রতি শস্যচক্রে (২২-২৮ দিন) প্রায় ১৫০ টাকা লাভ হয়। এইভাবে মোট আয় হবে প্রায় ২২৫০ টাকা। বাজারে প্রতি কেজি কাঁচা মাশরুমের দাম ১৫-২৫ টাকা। সুতরাং ১০০০ বর্গফুট (১০০'X১০') এলাকায় মাশরুম চাষ করলে মোট চাষযোগ্য এলাকা পাওয়া যাবে ৩৬০০ বর্গফুট। মোটামুটিভাবে মাশরুম তৈরির খরচ-খরচা পড়বে ২০-২৫ হাজার টাকা (৭০ দিনের জন্য)। ১৮০০ প্যাকেট স্পনের দাম প্রায় ৯ হাজার টাকা। পোয়াল বা ধানের বিচালির দাম ৫ হাজার টাকা। আরো আনুসঙ্গিক খরচ ৩ হাজার টাকা। তাহলে মোট ব্যয় দাঁড়াচ্ছে ৪২ হাজার টাকা। উৎপাদন প্রায় ৫৫০০ কেজি কাঁচা মাশরুম। এর বিক্রয়মূল্য ৮২ হাজার টাকা। অর্থাৎ নিট মুনাফা প্রায় ৪০ হাজার টাকা।

মাশরুম চাষ তাই খুবই লাভজনক ব্যবসা। গ্রামবাংলা তথা ভারতের গ্রামাঞ্চলে মাশরুম চাষ প্রসার লাভ করলে দেশের আর্থ-সামাজিক পুনরুত্থান (Socio-economic resurgence) ঘটবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ভোজ্য ও বিষাক্ত মাশরুম

সাধারণভাবে বলতে গেলে ভোজ্য ছত্রাক প্রজাতিগুলিকেই মাশরুম বলে। বিষাক্ত ছত্রাকদের টোড্স্টুল্ বা "ব্যাঙের গু" বা "ব্যাঙের বিষ্ঠা" বলা হয়, যদিও এটা কোনো বৈজ্ঞানিক শব্দ নয়। অঙ্গসংস্থানবিদ্যা অনুযায়ী "ব্যাঙের ছাতা" এবং "ব্যাঙের বিষ্ঠা" একই ধরনের প্রায় দেখতে এবং এদের মধ্যে পার্থক্য বোঝা মুশকিল। তবে এরা প্রত্যেকে বিভিন্ন 'জেনেরা' বা একই জেনাসের বিভিন্ন প্রজাতির অন্তর্গত। তৎসত্ত্বেও এদের রাসায়নিক গঠন (Chemical composition) ভিন্নতর। প্রথম শ্রেণী (মাশরুম) খাদ্য হিসাবে এটি খুবই নিরাপদ, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে ('ব্যাঙের বিষ্ঠা') কতকগুলি বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে।

যদিও প্রায় ১০০০-এর বেশি ভোজ্য মাশরুম রয়েছে, ভারতে এ পর্যন্ত ১৫০টি প্রজাতির মাশরুম পাওয়া গেছে।

এখন প্রশ্ন হ'ল—কিভাবে একজন ভোজ্য ও বিষাক্ত মাশরুম চিনতে পারবে? সত্যিকথা বলতে কি, এ প্রশ্নের উত্তর খুবই কঠিন। এ ব্যাপারে কোনো বিশেষ সাধারণ সূত্র বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনো নেই—যার দ্বারা ভোজ্য এবং বিষাক্ত মাশরুম সহজেই আলাদা করা যাবে। এ ব্যাপারে স্বল্প কিছু গবেষণা এবং বইপত্র যদিও রয়েছে, কিন্তু তা মোটেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য নয়। কিছু দেশজ প্রাচীন পরীক্ষা পদ্ধতি থাকলেও, তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য নয়। সাধারণভাবে বলা যায়, ভোজ্য মাশরুম খোলামাঠে জন্মায় এবং বিষাক্ত মাশরুম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বা গাছে জন্মায়। এ বিষয়ে কিছু ঐতিহাসিক বিশ্বাস (Traditional beliefs) নিম্নরূপ—

- ভোজ্য মাশরুমের আঁশ খুব সহজেই ছাড়ানো যায় এবং রুপালি মাশরুম রান্নার

সময় কালচে হয়ে যায়। কিন্তু Amanita phalloids একটি বিষাক্ত মাশরুম, এটিও সহজে ছাড়ানো যায়।

● ডাঁটার নিচে ভল্‌ভা (Volva) সহ মাশরুম খাদ্য হিসাবে নিরাপদ নয়। কিন্তু Amanita caesaria, Amanita rubescense প্রভৃতি প্রজাতির যদিও গোড়ার নিচে ভল্‌ভা আছে, এগুলি খাদ্য হিসাবে নিরাপদ।

● সাধারণভাবে বলা হয় উজ্জ্বল রঙের মাশরুম বিষাক্ত। সাদা বা মাখন রঙের মাশরুম ভোজ্য। এটাও সব সময় সত্যি নয়, যেমন—Amanita phalloids, Amanita vevna ও Amanita verosa জাতগুলির রঙ সাদা হলেও সাঙ্ঘাতিক বিষাক্ত।

● যেসব মাশরুমের দুধেল রস আছে, সেগুলি ভোজ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। এই বিশ্বাসের বিপরীতে আবার দেখা যায় Lactarius volemus প্রজাতির মাশরুমে প্রচুর দুধেল রস রয়েছে, অথচ এটি ভোজ্য হিসাবে নিরাপদ।

● সাধারণভাবে বলা যায় যে, একটি 'গণ' বা 'জেনাসের' মধ্যে অনেক ভোজ্য মাশরুমের কিছু বিষাক্ত মাশরুমও রয়েছে, যেমন—এগারিকাস (Agaricus)। Agaricus xanthoderma একটি বিষাক্ত মাশরুম। একইভাবে একটি জেনাসে অনেকগুলি বিষাক্ত প্রজাতি থাকলেও তাদের মধ্যে কিছু অ-বিষাক্ত ভোজ্য মাশরুমও রয়েছে, যেমন—Amanita rubescense একটি ভোজ্য মাশরুম।

● কয়েকটি ভৌগোলিক কুল বা বংশের মাশরুম (geographical races of mushroom) বেশ বিষাক্ত, যদিও সবগুলি নয়।

● আর একটি মুশকিল ঘটনা হ'ল—কিছু মাশরুম তাজা এবং ছোট অবস্থায় নিরাপদ ও ভোজ্য। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এগুলি আবার বিষাক্ত এবং সেসময় এদের পচন ধরে।

● 'গিল' (gill) বা ফুলকার রঙ দেখে অনেক সময় ভোজ্য এবং বিষাক্ত মাশরুমের পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। যেমন Lapiota margani ও Lapiota rachodes দুটি প্রজাতির মাশরুমের ফুলকার রঙ ছোট অবস্থায় একই রকম দেখতে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান অবস্থায় প্রথম প্রজাতির ফুলকার রং সবুজ দেখতে হয়, যা খুবই বিষাক্ত মাশরুম বলে বিবেচ্য। অথচ বর্ধনশীল অবস্থায় দ্বিতীয় প্রজাতির ফুলকার সাদা রঙ দেখা দিলে, তা ভোজ্য মাশরুম হিসাবে পরিগণিত।

সুতরাং উপরের এই আলোচনার সারমর্ম অনুধাবন করলে বোঝা যায়, ভোজ্য ও বিষাক্ত মাশরুম চেনা বেশ মুশকিল। তাই কখনোই অপরিচিত মাশরুম খাওয়া একেবারেই উচিত নয়। বনে-বাদাড়ে অনেক সময় বিভিন্ন অপরিচিত এইসব মাশরুম খেয়ে গরিব উপজাতি শ্রেণীর লোকেরা তাদের জীবন বিপন্ন করেছে।

ভোজ্য এবং বিষাক্ত মাশরুম যথাযথ চিহ্নিতকরণে সবসময়ই ছত্রাক বিজ্ঞানীদের (Mycologists) পরামর্শ ও সাহায্য নেওয়া দরকার। সুতরাং পরিশেষে এটা বলা ভাল, আজ অবধি ভোজ্য ও বিষাক্ত মাশরুম সহজে চিহ্নিত করার কোনো বিশেষ ফর্মুলা বের হয়নি। যাই হোক, নতুন যাঁরা এই মাশরুম শিল্পে আসবেন, তাঁদের খুব সতর্কভাবে এ

বিষয়ে এগোতে হবে। অভিজ্ঞতা ও সময়ের ব্যবধানে এ বিষয়ে কিছুটা জ্ঞানলাভ তো হবেই। কুকুর বা অন্য জীবজন্তুকে সন্দেহজনক প্রজাতির মাশরুম খাইয়েও নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে স্বল্প পরিমাণে নিজেরা খেয়ে তার প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে। Amanita, Russula, Psilocybe প্রভৃতি গণের অনেক প্রজাতির মাশরুম এতই বিষাক্ত যে, খাওয়ার স্বল্পকালীন সময়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এই বিপদ ঠেকাতে অনেক সময় গ্রামাঞ্চলে এন্টিটোড্ ঔষধ বা ডাক্তার না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাই কখনোই এসব ঝুঁকি না নেওয়াই উচিত। সমস্ত প্রকার মাশরুমের মধ্যে Amanita verna সব থেকে ভয়ঙ্কর বিষাক্ত। সুতরাং খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য নির্ভরযোগ্য নামী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে মাশরুম সংগ্রহ করাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায়। চাষের জন্য বীজ সংগ্রহ করবারও একই পদ্ধতি।

চাষযোগ্য মাশরুম

সারা বিশ্বে প্রায় ১০০০ ভোজ্য মাশরুমের খবর এ অবধি পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে প্রায় ২০টি ভোজ্য মাশরুম ৯টি জেনেরা বা গণের অন্তর্গত এবং এদের এ অবধি খুব ভালভাবে চাষ করা হচ্ছে। এগুলির মধ্যে আবার মাত্র ৩টি জেনেরা—Agaricus (বোতাম ছাতু), Volvariella (পোয়াল ছাতু) এবং Pleurotus (ধিংড়ি বা ঝিনুক ছাতু) এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং এদের বাণিজ্যিক চাষে সফলতা পাওয়া গেছে।

ভারতে সাধারণত বর্তমানে তিন ধরনের মাশরুমের চাষ হয়—Agaricus bisporus (সাদা বোতাম ছাতু), Volvariella volvacea (পোয়াল ছাতু) এবং Pleurotus sajor-caju (ধিংড়ি বা অয়স্টার বা ঝিনুক ছাতু)। এদের মধ্যে সাদা বোতাম ছাতু সারাবিশ্বে সবথেকে বেশি জনপ্রিয় এবং এটির ব্যবসাভিত্তিক প্রসার ও লাভ সবথেকে বেশি।

বিভিন্ন জাতের ভোজ্য মাশরুম যেগুলি বাণিজ্যিক সফলতা পেয়েছে, তা নিম্নরূপ—

১। Agaricus bisporus ও Agaricus bitorguis

২। Volvariella volvacea, V. diplasia ও V. esculenta

৩। Pleurotus sajor-coju, P. ostreatus, P. flabellatus, P. eryngii, P. sapidus এবং P. cornucopiae

৪। Flammulina velutipes

৫। Auricularia auricula, A. polytricha, এবং A. fuscosuccinea (জেলি ছত্রাক)

৬। Stropharia rugoso annulata

৭। Pholiota nameco, P. adiposa, P. lenta এবং P. tubirica

৮। Lentinus edodes (Shiitake)

৯। Tremella fuciformis

স্বাভাবিক জলবায়ু অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতের সমতল অঞ্চলে বছরের বিভিন্ন মাসে মাশরুম চাষের মরসুম নিম্নরূপ—

১। সাদা বোতাম ছাতু (White button mushroom)–ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি। এটি শীতকালীন ছাতু (temperate) হিসাবে পরিচিত।

২। পোয়াল ছাতু (Paddy-straw mushroom)—জুন থেকে অক্টোবর। এটি গ্রীষ্মকালীন ছাতু হিসাবে পরিচিত।

৩। ধিংড়ি বা ঝিনুক ছাতু (Oyster mushroom)—প্রায় সারাবছর। এটি নাতি গ্রীষ্মকালীন ছাতু হিসাবে পরিচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উদ্ভিদবিদ্যা

খাদ্য এবং ঔষধ হিসাবে মাশরুমের ব্যবহার মানব সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম থেকেই জানা যায়—বিশেষ করে মানুষ জাতি যখন থেকে পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা লাভ করতে শেখে। গ্রীক এবং রোমানরা মাশরুমের বহুবিধ ব্যবহারের কথা জানতো। প্রাচীন ভারতীয়রাও মাশরুমের ব্যবহার জানতো। কালিদাসের কাব্যে শিলীন্ধ্র নামে যে উদ্ভিদের বর্ণনা পাওয়া যায়, অনেকের মতে তা 'ব্যাঙের ছাতা'।

শব্দপ্রকরণ শাস্ত্র অনুযায়ী ''Mycology'' (ছত্রাকবিজ্ঞান) কথাটি এসেছে গ্রীকশব্দ ''mykes'' বা মাশরুম এবং ''logos'' বা আলোচনা (discourse) থেকে। সুতরাং বড় শরীরযুক্ত ছত্রাক (মাশরুম) বিষয়ে পঠন-পাঠন প্রকৃতিবিদ্ ও জীববিদ্যা বিশারদদের দীর্ঘদিন আগে থেকেই আকর্ষণ করে, বিশেষ করে অনুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope) আবিষ্কারের আগে, যা ভ্যান্ লিইউয়েন হক্ (Van Leeuwonhock) সপ্তদশ শতাব্দীতে আবিষ্কার করেন, কিংবা সরল লেন্সের সাহায্যে বিজ্ঞানী জগৎ গবেষণা শুরু করেছিলেন।

শ্রেণীবিন্যাস (Taxonomical classification)

আগেই বলা হয়েছে, মাশরুম হ'ল একটি সাধারণ শব্দ, যা এক কথায় মাংসল ছত্রাকের ফলন্ত শরীর (fruiting bodies of the fleshy fungi) এবং এরা বিভিন্ন শ্রেণীর ছত্রাকের অন্তর্গত।

মাশরুম এবং অন্যান্য ছাত্রাক যদিও এতদিন ধরে উদ্ভিদ রাজ্যের (plant kingdom) একটি আলাদা বিভাগ, এখন তারা জীবন্ত রাজ্যে প্রাণী রাজ্য, উদ্ভিদ রাজ্য প্রোমিষ্টা এবং মৌনেরার ন্যায় একটি সমতুল্য বিভাগে উন্নীত হয়েছে। সত্যি বলতে কি, ছত্রাক হ'ল এক শ্রেণীর জীবন্ত উদ্ভিদ, যা দেখতে সবুজ উদ্ভিদের মত, অথচ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তাদের উদ্ভিদের ন্যায় কোষ প্রাচীর (cell walls) এবং এককোষী অযৌন জননাঙ্গ (spores) দ্বারা বংশবৃদ্ধি হয়। এদের ক্লোরোফিল বা সবুজকণা থাকে না। তাই খাদ্য তৈরিতে অন্যের উপর নির্ভর করে শরীরের গঠন ও বৃদ্ধি ঘটায়।

অন্যান্য যে কোনো জীব রাজ্যের ন্যায় ছত্রাক রাজ্যের (the kingdom of fungi) শ্রেণীবিন্যাসকে এইভাবে ভাগ করা যায়—বিভাগ (Division), উপ-বিভাগ (Sub-Division), শ্রেণী (Class), উপ-শ্রেণী (Sub-class), অর্ডার বা বিন্যাস (Order), বংশ (Family), গণ (Genus), কুল বা প্রজাতি (Species), জাত (Variety or cultivar), ইত্যাদি তাদের পার্থক্যগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী।

মোট ৯টি শ্রেণীর ছত্রাক রয়েছে এবং মাশরুম মাত্র ২টি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—অ্যাস্কোমাইসিটিস্ (Ascomycetes) এবং বেসিডিওমাইসিটিস্ (Basidiomycetes)। দলগতভাবে মাশরুম হ'ল মাংসল বড় ছাতার মত দেখতে ছত্রাক সমূহ, যার অধিকাংশই বেসিডিওমাইসিটিস্ শ্রেণীভুক্ত। সমস্ত ছত্রাক শ্রেণীদের মধ্যে এই শ্রেণী খুবই উন্নত। মাত্র কিছু মাশরুম, যেমন—মোরেল্স্, মরচেলা (Morchella) গণভুক্ত, অ্যাস্কোমাইসিটিস্ শ্রেণীভুক্ত এবং এগুলি ভোজ্য, অথচ চাষ করা যায় না। এই দুই শ্রেণীর প্রাথমিক পার্থক্য হ'ল—বেসিডিওমাইসিটিসের বেসিডিয়াম এবং বাইরে বেসিডিওস্পোরস্ তৈরি হয়। অ্যাসকোমাইসিটিসের ভিতরে একটা থলির মত (sac-like) অ্যাস্কোস্পোরস্ তৈরি হয়। একে অ্যাসকাস্ বলে।

বেশির ভাগ ভোজ্য মাশরুম (চাষযোগ্য ও অচাষযোগ্য) এবং "ব্যাঙের বিষ্ঠা" বেসিডিওমাইসিটিস্ শ্রেণীভুক্ত এবং উপ-শ্রেণী হোমোবেসিডিওসেটিডি, বিন্যাস অ্যাগারিকেল্স, ৫টি বংশের মধ্যে এগারিকেসী এবং অ্যামানিটেসী (Agaricaceae and Amanitaceae)। হোমোবেসিডিওসেটিডির মধ্যে খুব বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। কারণ মাশরুমের পুষ্টিযুক্ত খাদ্যগুণ ও অন্যান্য বিশদ গবেষণাই এই উপ-শ্রেণী বিষয়ে করা হয়েছে।

অঙ্গসংস্থানবিদ্যা (Morphology)

খুব স্পষ্ট করে বলা ভাল যে মাশরুম সম্পূর্ণ ছত্রাক নয়। এটা ছত্রাকের জনন অঙ্গ ও তার আনুষঙ্গীক অংশ মাত্র। মাইসেলিয়ামের সাহায্যে ছত্রাকের দেহ গঠিত হয়। ওরাই ছত্রাকের দেহের একক।

ছত্রাকের যথাযথ সংজ্ঞা প্রদানের পরই এদের জনন অবস্থার কথা বলা যাক। ছোট ছো'ট গাঁট (Knot) হাইফ্যাল্ কোষ দিয়ে তৈরি হয়ে সাধারণত আলপিনের মাথার মত দেখতে হয় এবং তারপর গোলাকার (Globose) বা ডিম্বাকৃতি শরীরে পরিণত হয়। সাধারণভাবে এদের বোতাম (Button) বলে। বোতামগুলি আস্তে আস্তে বড় হয়ে পরিণত অবস্থায় পুরোপুরি ছাতা বা ফ্যানের মত দেখতে হয়। বোতাম ছাতু শিশু অবস্থায় বোতামের মত দেখতে হয় বলেই এই নামে পরিচিত। একইভাবে ঝিনুকের মত (Oyster) নামকরণও হয়েছে, তাদের ঝিনুকের মত (Oyster shaped) দেখায়। ধিংড়ি ছাতুকে তাই ঝিনুক বা শুক্তি ছাতুও বলা হয়।

মাশরুমের প্রধান অংশ এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হ'ল। ছবিতে প্রতি অংশ চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে (চিত্র ১ ও ২)।

দণ্ড বা বোঁটা (Stalk or Stipe)

একটি পরিপূর্ণ শরীরের মাশরুমে একটি লম্বা দণ্ড বা বোঁটা বা স্টাইপ থাকে। এর মাথায় থাকে টুপি (Cap or pileus)। এর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি এবং উপরের অংশের সঙ্গে লেগে থাকার অংশ (কেন্দ্রীয় বা পার্শ্বিক) প্রতি গণের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন।

চিত্র : ১. মাশরুমের গঠন।

চিত্র : ২. বোতাম ছাতুর বিভিন্ন অংশ।

মাশরুমের ডাঁটা বা দণ্ড মাংসল, জমাট (Solid) বা ফাঁপা (Hollow) হতে পারে এবং এর আকৃতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

পরদা বা ভেইল্ (Veil) বা অ্যানুলাস্ (Annulus)

এই পরদা অংশটি মাথার টুপির ধার থেকে স্টাইপ্ বা দণ্ড অবধি ছোট অবস্থা থেকে ফলন্ত শরীর তৈরি অবধি বিস্তার লাভ করে। বোতাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই পাতলা স্পর্শকাতর কলা (Delicate tissue) ভেঙে যায়। কিন্তু এদের কিছু অংশ টুপির ধারে আবদ্ধ থাকে। অন্য অংশ স্টাইপের উপর একটি গোলাকার আংটি (Ring) তৈরি করে। একেই "অ্যানুলাস্" বলে। পোয়াল ছাতুতে এই দণ্ডটি খুবই সরু এবং মাংসল হয়, রিং বা গোলাকার আংটির মত অংশ থাকে না। এর বদলে একটি দৃষ্টি আকর্ষক কাপের মত গঠন থাকে। একেই Volva (ভল্‌ভা) বলে, যা দণ্ডের গোড়ায় থাকে। ধিংড়ি ছাতুতে দণ্ডটি খুবই ছোট হয়।

গিলস্ বা ল্যামেলি (Gills or Lamellae)

ক্যাপের নিচে গোলাকারে এই ফুলকা বা গিলস্ থাকে। এগুলিতেই স্পোরস্ বা ডিম্বাণু থাকে। এদের রঙ বদলায়। গিলের অন্তর্কলাকে 'ট্রমা' বলে। লম্বা কোষ দিয়ে এই ট্রমা গঠিত। বোতাম ছাতু কাটলেই গিলসের গঠন দেখতে পাওয়া যাবে। ক্যাপের নিচেই গিলস্ বা ফুলকা ঝুলে থাকে। এটি খুব পাতলা, সরু অথবা চওড়া কলার ফালির মত।

ক্যাপ্ বা পিলিয়াস্ (Cap or Pileus)

এটি হ'ল মাশরুমের উপরের অংশ। বিভিন্ন জাতের মাশরুমে এটি বিভিন্ন আকারের দেখতে হয়। কার্পোফোরের (Carpophore) প্রসারিত অংশ এটি। জাত অনুযায়ী ক্যাপ্ মোটা, মাংসল বা রাবারের মত (corky) এবং মসৃণ বা অমসৃণ হয়। এদের রঙও ভিন্ন হতে পারে। বোতাম এবং পোয়াল ছাতুতে ক্যাপের আকার ছাতার মত দেখতে হয়। কিন্তু ধিংড়ি ছাতুতে ছোট অবস্থায় ফ্যানের মত এবং ক্রমশ গভীর খাঁজ (Deeply lobbed) দেখা যায়।

জীবনচক্র (Life cycle)

মাশরুমের জীবনচক্র শুরু হয় স্পোর বা ডিম্বাণুর অঙ্কুরোদ্গমের শুরু থেকেই। অনেক সংখ্যক স্পোর গিলের দুধারে জন্মায়। উপযুক্ত আধারে (Substrate) স্পোরগুলি অঙ্কুরোদ্গমের পরেই জার্মটিউব (Germ tube) তৈরি করে এবং এককোষী মনোক্যারিয়োটিক প্রাথমিক মাইসেলিয়াম (Monokaryotic primary mycelium) প্রস্তুত করে। ২৫ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় ও নিরপেক্ষ পি. এইচ. (pH)-এ অঙ্কুরোদ্গম হয় না। কার্বনডাই অক্সাইডের ঘনত্ব ২% এর বেশি হলে (আয়তনে) স্পোর অঙ্কুরোদ্গম বাধাপ্রাপ্ত হয়।

জার্মটিউব লম্বা সুতার মত একটি গঠন তৈরি করে, তাকে হাইফা (Hypha) বলে। এটি আড়াআড়ি দেওয়াল (cross walls বা septa) এবং শাখাগুলির সঙ্গে খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

যেকোনো একটি বিশেষ মাশরুমের (বোতাম ছাতু) ছবি এখানে ৩ নং চিত্রে দেখানো হল।

চিত্র : ৩. বোতাম ছাতুর জীবনচক্র

a—জার্মটিউব, b—ভেজিটেটিভ্ হাইফা, b_1—সেপটেট্ হাইফা, b_2—অপ্রধান স্পোরস্, b_3—ক্ল্যামিডোস্পোরস্, c—পিনস্ বা প্রাইমোর্ডিয়া (প্রারম্ভিক ফলন্ত শরীর), d—বেসিডিয়াম (প্রাথমিক অবস্থায়), e—নিউক্লির একীকরণ, f—চার হ্যাপ্লয়েড নিউক্লির মাইটোসিস, g—একজোড়া নিউক্লি স্টেরিগমেটার মধ্য দিয়ে বর্ধনশীল স্পোরে যাচ্ছে, h—একটি স্পোর।

এই **ইউনি-নিউক্লিয়েট হাইফ্যাল্** দশা খুবই স্বল্পকালীন সময়ের জন্য ঘটে। উপযুক্ত হাইফার মিলনে এটি **বাই-নিউক্লিয়েট**-এ পরিণত হয় এবং পরে তা প্রচুর শাখা-প্রশাখাসহ বর্ধিত হয়ে **দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত** (Secondary), এমনকি **তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত** (tertiary) মাইসেলিয়াম এ পরিণত হয়, যা ফলন্ত শরীর গঠনে (Fruiting body formation) খুবই প্রয়োজনীয়। ডিপ্লয়েড় নিউক্লিয়াসের মিয়োসিস পদ্ধতির মাধ্যমে এক জোড়া নিউক্লি (nuclei) বেসিডিওস্ফোর গঠনে সাহায্য করে।

পোয়াল ছাতুর বেসিডিওস্ফোরে মাত্র **একটি নিউক্লিয়াস** থাকে। নির্দিষ্ট স্তরে গিলস্-এর বহির্ভাগে বেসিডিয়ামের মধ্যে স্পোর বা ডিম্বাণু তৈরি হয়। এদের বলা হয় **হাইমেনিয়াম** (Hymenium)। এর মধ্যবর্তী অংশ একত্রেবোনা হাইফ্যাল্ কলা কোষে (Interwoven hyphal tissue) গঠিত। একে বলা হয় **ট্রমা** (Trama)।

দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত মাইসেলিয়ামের গঠন পদ্ধতি, ফলন্ত শরীর প্রাইমোডিয়ার গঠন (Formation of fruiting body primordia), স্পোর গঠন এবং তাদের বিস্তার (Dispersal) ইত্যাদি অবিরামভাবে চলে। এইভাবে একদিকে মাশরুম উৎপন্ন হয় এবং আর একদিকে মাশরুমের জীবনচক্র সম্পন্ন হয়।

বাসস্থান এবং অভিযোজন (Habitat and Adaptability)

প্রায় প্রতি দেশে বিভিন্ন কৃষি জলবায়ুতে এবং পরিপার্শ্বীয় অবস্থানে প্রাকৃতিক উপায়ে মাশরুম জন্মায়। কিছু মাশরুমের অবশ্য বিশেষ অবস্থানেও নির্দিষ্ট বাসস্থানে অভিযোজন ঘটে। কিন্তু সাধারণভাবে মাশরুমের ব্যাপক অভিযোজন ক্ষমতা রয়েছে। সমস্ত ধরনের মাটি, বনাঞ্চল, কাঠ, খোলামাঠ, পাহাড়-পর্বতমালা, মরুভূমি, মৃত কাঠের গুঁড়ি, গাছের ডাল বা কিছু পচা জৈব পদার্থের উপর সাধারণভাবে মাশরুম জন্মায়। শহর ও শহরতলির বাসিন্দারা প্রায়ই তাঁদের বাগানে এবং লনে, রাস্তার ধারে মাশরুম দেখে থাকবেন। বেশির ভাগ ভোজ্য মাশরুম **এগারিকেল্স** অর্ডারের আওতাভুক্ত এবং প্রাকৃতিতে এগুলি বিশ্বজনীন।

যদিও মাশরুম বছরের সব ঋতুতেই দেখা যায়, তবে **সব থেকে বেশি দেখা যায় বৃষ্টির মরসুমে পচা খড়ের/অন্যান্য জৈব পদার্থের উপর**। তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা এ সময় বেশি থাকে। বর্ষাকালে দু-এক পশলা বৃষ্টির পর বিভিন্ন ধরনের মাশরুম এখানে ওখানে দেখা যায়। গ্রামের লোকেরা অনেকেই দেশজ জ্ঞানের সাহায্যে ভোজ্য মাশরুমের অনেক প্রজাতিই চিনতে পারে। এগুলি সাধারণত খোলামাঠে, বনে-জঙ্গলে, সাদা পিঁপড়ের ঢিবিতে, পচা খড়ের গাদাতে বর্ষাকালেই নানা জায়গায় দেখা যায়। এগুলি তুলে এনে এরা রান্না করে সাধারণত নিজেদের চাহিদা মেটায়। পোয়াল ছাতু সাধারণত বর্ষাকলে পচা খড়ের গাদায়, প্রাকৃতিক অবস্থায় গ্রামাঞ্চলে খুব জন্মায়। এগুলি খেতে খুবই সুস্বাদু (চিত্র ৪ ও ৫)।

চিত্র : ৪. পোয়াল ছাতু

চিত্র : ৫. ধিংড়ি ছাতু

তৃতীয় অধ্যায়

শারীরবৃত্তি (Physiology)

মাশরুমের যথাযথ বৃদ্ধি এবং ফলনে শারীরবৃত্তীয় প্রভাব, পরিবেশ এবং পুষ্টিগত চাহিদা যথেষ্টভাবে জড়িত। এগুলিই এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

পরিবেশগত চাহিদা (Environmental Requirements)

যেকোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের মত মাশরুমের বৃদ্ধি ও ফলনে পরিবেশের প্রভাব গভীর ভাবে লক্ষ্য করা যায়। এ গুলির মধ্যে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, পি. এইচ., আলো, বাতাস চলাচল ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্যতম। এগুলির চাহিদা বিভিন্ন মাশরুমের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। সুষ্ঠু পরিবেশেই মাশরুমের অঙ্গজ বৃদ্ধি ও ফলন্ত শরীরের গঠন সর্বোত্তম হয়।

তাপমাত্রা (Temperature) : সমস্ত প্রাকৃতিক প্রভাবকের মধ্যে তাপমাত্রা হ'ল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। তাই মাশরুম চাষের সাফল্য মূলত তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। তাপমাত্রার ব্যবহার অনুযায়ী মাশরুমকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) **নাতিশীতোষ্ণ** (temperate), (২) **গ্রীষ্মমণ্ডলীয়** (tropical) এবং (৩) **উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয়** (sub-tropical)।

বোতাম ছাতু একটি নাতিশীতোষ্ণ জাতের মাশরুম, ২২°-২৫° সে. তাপমাত্রায় এর অঙ্গজ বৃদ্ধি সর্বোত্তম হয়। কিন্তু এই ছাতুর ফলন্ত শরীর গঠনের জন্য প্রয়োজন ১৫°-১৮° সে. তাপমাত্রা। ৩০° সে. তাপমাত্রায় এর মাইসেলিয়াম বৃদ্ধি একেবারেই প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। যদিও এর ফলন্ত শরীরের গঠন ২০° সে. তাপমাত্রাতেও হয়, তার গুণমান খুবই নিকৃষ্ট হয় এবং ১৫° সে. তাপমাত্রার নিচে এই ছত্রাকের বৃদ্ধি খুবই শ্লথগতিতে চলে। খুব বেশি তাপমাত্রায় এসব মাশরুম মোল্ড, ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয় এবং ফসল নষ্ট হয়।

ধিংড়ি বা ঝিনুক ছাতু কিছুটা বেশি ব্যবধানের তাপমাত্রায় (২০°-৪০° সে.) অঙ্গজ বৃদ্ধির সময় সহ্য করতে পারে। তবে প্রচুরভাবে ফলন্ত শরীর গঠনের জন্য ২২°-২৬° সে. তাপমাত্রা সর্বোত্তম।

পোয়াল ছাতু হ'ল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফসল। এর অঙ্গজ বৃদ্ধিতে সর্বোত্তম তাপমাত্রা হ'ল ৩০°-৩৫° সে. এবং ফলন্ত শরীর গঠনের জন্য ২৬°-৩৫° সে. তাপমাত্রা আদর্শ। অঙ্গজ বৃদ্ধি ২০° সে. তাপমাত্রার নিচে এবং ৪০° সে. তাপমাত্রার উপরে ব্যাহত হয়।

আর্দ্রতা (Humidity) : আর্দ্রতাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং মাশরুম চাষে খুব সতর্কভাবে এর প্রয়োজন ও ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাশরুম চাষে বায়ু পরিমণ্ডল

খুব বেশি ভেজা বা খুব বেশি শুকনো হলে চলবে না। সঠিক আর্দ্রতা সম্পৃক্ত বায়ুমণ্ডলই মাশরুম চাষের আদর্শ। সুতরাং জল দেওয়ার সময় মাশরুমের বেডগুলিতে সমানভাবে স্প্রে করে বাইরের চারদিকে ভিজিয়ে রাখতে হবে, যাতে প্রয়োজনমত আর্দ্রতা রাখা হয়।

বাতাস চলাচল (Ventilation) : ঘরের মধ্যে মাশরুম বৃদ্ধির সময় ভালভাবে বাতাস চলাচল ব্যবস্থা রাখা অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বাতাস চলাচল ব্যবস্থার ফলে একদিকে তাজা বাতাস (অক্সিজেন) ভেতরে প্রবেশ করে, অন্যদিকে ঘরের দূষিত বাতাস (কার্বনডাই অক্সাইড, প্রভৃতি) দূরীভূত হয়। এতে তাই CO_2 এবং অক্সিজেনের ভারসাম্য বজায় থাকে। খুব বেশি CO_2 মাশরুম ফলনের পক্ষে ক্ষতিকর, এতে ফলন অনেক কমে যায়।

সুতরাং ঘরের মধ্যে এখনকার আধুনিক উন্নত পদ্ধতিতে মাশরুম চাষে সুষ্ঠু বাতাস চলাচলের জন্য উপযুক্ত যান্ত্রিক ব্যবস্থা খুবই প্রয়োজন। ধিংড়ি ছাতু বেশি পরিমাণে CO_2 এর ঘনত্ব কিছুটা সহ্য করতে পারে। কম্পোস্ট আধারে বাইরের জীবাণু বৃদ্ধি দমিত অবস্থায় রাখলে মাশরুমের বৃদ্ধি খুব ভাল হয়।

আলো (Light) : মাশরুম চাষে যদিও আলোর বিশেষ প্রভাব তেমন নেই, তবে বোতাম ছাতু চাষে মাশরুমের রঙ অনেক সময় আলোর প্রভাবের উপর নির্ভর করে। বোতাম ছাতুর ক্রিম বা মাখন রঙের জাত (strains) অন্ধকারে কম রঙ গঠন করে।

পোয়াল ছাতু চাষে বেশি আলোর প্রয়োজন হয় এবং এর ফলন্ত শরীরের গঠন অন্ধকারে ব্যাহত হয়। খুব কম সূর্যকিরণে বা নিয়ন আলোতে পোয়াল ছাতুর সর্বোত্তম বৃদ্ধি ঘটে।

পি. এইচ (pH) : আধারের (substate) pH (অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের পরিমাপ) মাশরুমের বৃদ্ধি ও গঠনে প্রভাব বিস্তার করে। **বোতাম ছাতুতে pH ৬ সর্বোত্তম অঙ্গজ** বৃদ্ধি ঘটায়। অথচ এই ছাতুর ফলন্ত শরীর গঠনে pH ৬.৯ খুবই আদর্শ।

ধিংড়ি ছাতু চাষে pH ৫.৫-৬.৫ সর্বোত্তম বলে দেখা গেছে। **পোয়াল ছাতু** চাষের জন্য pH ৬.৭ সর্বোৎকৃষ্ট।

সাধারণভাবে বলা যায়, pH ৩.৫ থেকে ৮.৯ এর মধ্যে অধিকাংশ মাশরুমের প্রজাতি সহ্য করার ক্ষমতা রাখে এবং এদের চাষকরা সম্ভব হয়।

পৌষ্টিক চাহিদা (Nutritional Requirement) : সাধারণভাবে মাশরুম বিভিন্ন সূত্রের পচা লিগ্নিন-সেলুলোজ দ্রব্যের মধ্যে ভাল জন্মায়। দেখা গেছে, মাশরুমের অঙ্গজ বৃদ্ধি এবং জনন বৃদ্ধি দশায় পৌষ্টিক চাহিদা একটু ভিন্নতর হয়, যদিও **কার্বন** মাশরুমের মূল খাদ্য। সুতরাং ভালভাবে পচা কম্পোস্টই হ'ল মাশরুম চাষের প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা।

কার্বন ছাড়া **নাইট্রোজেন** আর একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য। মাশরুমের সর্বোত্তম অঙ্গজ বৃদ্ধি ও গঠনের জন্য এই পুষ্টি খাদ্যের প্রয়োজন হয়। তাই খড়ের সঙ্গে নাইট্রোজেন ঘটিত সার মিশিয়ে কম্পোস্ট তৈরি করলে ভাল কাজ দেবে। তবে এর এই মিশ্রণে সঠিক মাত্রায় **ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম** এবং **ম্যাগনেসিয়াম** যোগ করা দরকার। এতে মাশরুমের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ সুষ্টুভাবে সম্পন্ন লাভ করবে।

উপরে বর্ণিত খাদ্য ছাড়াও আরো কিছু বিশেষ ভিটামিন (Vitamins) এবং বৃদ্ধি উৎসেচ পদার্থ (হরমোন) মাশরুম বৃদ্ধি ও গঠনে ভাল ফল দেয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, বোতাম ছাতু চাষে বায়োটিন (biotin) এবং থিয়ামিন (Thiamin) যুক্ত করলে এদের বৃদ্ধি ভাল হয়। পাইরিডক্সিন, রিবোফ্লেভিন্ ইত্যাদি মিশ্রণে পোয়াল ছাতুর ফলন বৃদ্ধি পায় বলে জানা গেছে।

ধিংড়ি বা ঝিনুক ছাতু চাষে প্রোটিন-সমৃদ্ধ দ্রব্য কম্পোস্টে মিশ্রণ করলে এদের বৃদ্ধি ভাল হয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। একই ভাবে বৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য হরমোন জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহারে (যেমন—ইন্ডোল্ অ্যাসেটিক অ্যাসিড বা IAA, জিব্বারেলিক অ্যাসিড, এনুরিন ইত্যাদি) বিভিন্ন প্রজাতির মাশরুমের ভাল বৃদ্ধি ও গঠন হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

খাদ্যমূল্য ও বিকল্প পুষ্টিমান

এক দশক ধরে ভারত সরকার মাশরুম চাষের সম্প্রসারণ কাজ-কর্ম শুরু করেছে। উদ্দেশ্য হ'ল, প্রোটিন অপুষ্টতা (protein malnutrition) দেশ থেকে দূর করা, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। এছাড়া কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা, গ্রামের দরিদ্র মানুষদের আয় বাড়ানো, গ্রামের কৃষি বর্জ্য পদার্থ (agro-wastes) চক্রকারে ব্যবহার করা ও কিছু বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করা, প্রভৃতি মূল উদ্দেশ্য।

পরন্তু বিগত মাত্র ৩-৪ বছর ধরে ভারতে মাশরুম চাষের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র চাষীদের এটি একটি মরসুমী প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র চাষীদের এটি একটি মরসুমী কাজ (seasonal activity) হিসাবে শ্রম বহুল নতুন পথ দেখিয়েছে, বিশেষ করে নগর ও শহরের কাছেপিঠে যারা বসবাস করেন। এখন মাশরুম চাষ একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এই শ্রম-নিবিড় বৃত্তিতে (labour-intensive vocation) দেশের নিরামিষ ভোজী জনতার জন্য একটি উন্নত সুপাচ্য প্রোটিন বিকল্প খাদ্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

আগেই বলা হয়েছে, মাশরুম তাদের উপাদেয় সুগন্ধ, সুপাচ্য, প্রোটিন যুক্ত খাদ্যগুণের জন্য খুবই জনপ্রিয়। মাশরুমে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, কার্বোহাইড্রেটস, ফ্যাট্ বা স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং শক্তি মূল্য (ক্যালোরি) থাকে। খাদ্য হিসাবে তাদের বিকল্প পুষ্টিমান মাংস এবং সবজির মাঝখানে অবস্থান করে। এদের স্বাদ বৃদ্ধি গুণাগুণের জন্য মাশরুম বিভিন্ন প্রকার মাংস, সবজি এবং ভাতে মিশিয়ে খাদ্যের বিশেষ গুণমান বৃদ্ধি করা যায়। বিশেষ করে শহর এবং বড় বড় নগরকেন্দ্রিক তথা শিল্পাঞ্চলের স্টার হোটেলে, রেস্টুরেন্টে, বারে মাশরুমের চাহিদা সাঙ্ঘাতিক রকমের বেশি।

দেশের ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং এখনো গতানুগতিক চাষবাস পদ্ধতির ফলে বর্তমান উচ্চশক্তি সম্পন্ন খাদ্যের সঙ্কট খুবই গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এই খাদ্য উৎপাদন প্রযুক্তি তথা কলাকৌশল ব্যবহার করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খাদ্যাভাব ঘোচানোর দৃঢ় সঙ্কল্প নিতে হবে। মাশরুম চাষ তাই মূল খাদ্যশস্য চাষের সঙ্গে একটি প্রোটিনযুক্ত ফসলের চাষ পদ্ধতি, যা দেশের আপামর জনতাকে অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাকে কম খরচে আরো উন্নত করতে চাই প্রোটিন, ভিটামিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট, বহুমূল্য লবণ এবং শক্তিমূল্য। মাশরুমই পারে এসবের জোগান দিতে। তাই মাশরুমকে "সবজির রানী" (Queen of Vegetables) বলা হয়।

মাশরুমে "কর্কট রোগের প্রতিরোধশীল খাদ্যগুণ" (Anti-Cancer food properties) রয়েছে বলে প্রমাণ করেছেন জাপানের জাতীয় ক্যানসার রিসার্চ ইনস্টিটিউট (The National Cancer Research Institute of Japan)। লিন্টজেল্ (Lintgel–১৯৪১, ১৯৪৩) পরীক্ষা করে বলেছেন যে, ১০০-২০০ গ্রাম শুষ্ক ওজনের মাশরুম একজন ৭০ কেজি ওজনের পূর্ণবয়স্ক প্রাপ্ত লোকের পুষ্টিগত দিক রক্ষা করতে সক্ষম। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মাশরুম পেশি-প্রোটিন (Muscle protein) এর পুষ্টিকর খাদ্যগুণের সমান এবং যেসব খাদ্যে প্রোটিনের অভাব রয়েছে, তার বিকল্প হিসাবে খুবই উপযুক্ত। তাই মাশরুমকে যথার্থই "সবজি-মাংস" (Vegetative meat) বলা হয়।

ভিটামিন (Vitamins)

সমস্ত প্রকার ভোজ্য মাশরুমেই প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ রয়েছে। তাদের ফোলিক অ্যাসিডের পরিমাণ (Folic acid বা Vitamin B, যা রক্ত গঠনে অত্যাবশ্যক) লিভার (যকৃৎ) এবং পালং এর থেকে উন্নত মানের। মাশরুমে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'বি' রয়েছে, যা কার্বোহাইড্রেট বিপাকে (Metabolism) খুবই প্রয়োজন। হার্টের কার্ডিয়াক্ যন্ত্রণা এবং বেরীবেরী রোগ এতে দূর হয়। ভিটামিন 'সি' শিশু বা বাচ্চাদের রক্তাল্পতা (scurvy) দূর করে এবং বহুরোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা জোগায়। ভিটামিন 'ডি' শরীরে সূর্যালোকের বিকল্প (Sunshine substitute) জোগান দেয়।

অ্যান্ডারসন্ ও ফেলারস (Anderson & Fellers—১৯৪২) প্রমাণ করেছেন যে, সাদা বোতাম ছাতুতে (Agaricus bisporus) ভিটামিন 'এ', 'ডি' বা 'ই' থাকে না। তাঁরা ১০০ গ্রাম তাজা ছাতুতে যেসব খাদ্যগুণ পেয়েছেন, তা এরূপ—৮.৬ মিলিগ্রাম অ্যাস্করবিক্ অম্ল, ৫.৮২ মিলিগ্রাম নিকোটিন অম্ল, ২.৩৮ মিলিগ্রাম প্যান্টোথেনিক অম্ল, ০.১২ মিলিগ্রাম থিয়ামিন, ০.৫২ মিলিগ্রাম রিবোফ্লেভিন এবং ০.০১৮ মিলিগ্রাম বায়োটিন।

মাশরুমে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়াসিন (niacin) এবং প্যান্টোথেনিক অম্ল থাকে, যা ত্বকের এবং অন্তত্বকের জন্য খুবই উপকারী। এছাড়া বিভিন্ন খনিজ পদার্থের দহন, যেমন—ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের সঙ্গে লোহা ও তামা মানুষের শরীরের হাড় ও দাঁতের গঠনের জন্য খুবই জরুরি। মাশরুমে ফোলিক অম্ল প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। মানুষের দেহের অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা রোগের প্রতিকারে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই মাশরুম অত্যধিক পরিমাণে "ডায়েবেটিক রোগীর খাদ্য" হিসাবে খুবই প্রয়োজন। এতে খুবই স্বল্প পরিমাণে কার্বোহাইড্রেটস্ ও ফ্যাট্ রয়েছে। যাঁরা নিজেদের বিশাল শরীরের ওজন ও মেদ ঝরাতে চান, মাশরুম অবশ্যই তাঁদের পক্ষে একটি আদর্শ খাদ্য।

মাশরুমে প্রচুর পরিমাণে রিবোফ্লেভিন, নিকোটিনিক অম্ল (নিয়াসিন), প্যান্টোথেনিক অম্ল এবং প্রয়োজনমাফিক থিয়ামিন, ফোলিক অম্ল ও অ্যাস্করবিক অম্ল থাকায় এটি একটি আদর্শ সুরক্ষাজনক খাদ্য। মানুষের শরীর গঠনে এগুলি খুবই প্রয়োজন (অ্যান্ডারসন এ.

এ. এবং ফেলারস্ সি. আর, ১৯৪২)। কয়েকটি ভোজ্য মাশরুমে বিভিন্ন খাদ্যপ্রাণের (ভিটামিন) পরিমাণ ১নং সারণীতে দেওয়া হল।

সারণী—১ : কয়েকটি ভোজ্য মাশরুমে ভিটামিনের পরিমাণ (মিলিগ্রাম / ১০০ গ্রাম শুষ্ক ওজন)

প্রজাতি	থিয়ামিন্	রিবোফ্লেভিন্	নিয়াসিন	অ্যাসকরবিক অম্ল
● সাদা বোতাম ছাতু (Agaricus bisporus)	১.১	৫.০	৫৫.৭	৮১.৯
● Lentinus edodes	৭.৮	৪.৯	৫৪.৯	০.০
● ধিংড়ি ছাতু বা ঝিনুক ছাতু (Pleurotus ostreatus)	৪.৮	৪.৭	১০৮.৭	০.০
● পোয়াল ছাতু (Volvariella volvacea)	১.২	৩.৩	৯১.৯	২০.২

প্রোটিন বা আমিষ পদার্থ (Proteins)

ভারতের অপুষ্টিযুক্ত খাদ্য তালিকায় মাশরুমের প্রোটিন একটি আদর্শ বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণযোগ্য। দানাশস্য, সবজি ইত্যাদি ফসলের একক এলাকায় উৎপাদন চিত্রের সঙ্গে এটি সহজেই তুলনা করা চলে। দানাশস্যে বছরে মোট উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৩০০০-৬০০০ কেজি। কিন্তু মাশরুমে বছরে ২ মিলিয়ন কেজি/হেক্টর পর্যন্ত উৎপাদন পাওয়া সম্ভব (কুক, ১৯৭৭)। সুতরাং এর থেকেই মাশরুম চাষে বিপুল পরিমাণ উচ্চ শক্তি সম্পন্ন পুষ্টিকর খাদ্যের উৎপাদন চিত্র সহজেই অনুমেয়।

এক একর জমির উৎপাদনকে প্রায় ১০গুণ ছত্রাক প্রোটিন তথা মাংসল প্রোটিন উৎপাদন সহজেই করা সম্ভব। এরূপ কয়েকটি ভোজ্য মাশরুম চাষে সারাবছর তাদের নিবিড় চাষবাসে বিশাল পরিমাণে বহুমূল্য প্রোটিন খাদ্য উৎপন্ন করা সম্ভব।

সারাবিশ্বে প্রায় দশহাজার জাতের মাংসল মাশরুম রয়েছে। এর মধ্যে ১০০ টির বেশি জাতে এরূপ উচ্চ শক্তি সম্পন্ন পুষ্টিকর খাদ্যগুণ রয়েছে। প্রায় ৫০০টি জাতের আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবসাভিত্তিক চাষ হচ্ছে।

নিচের ২নং সারণীতে প্রতি একক এলাকায় শুষ্ক প্রোটিনের উৎপাদন চিত্র দেওয়া হল— গোমাংস (Beef), মাছ এবং সাদা বোতাম ছাতু চাষের তুলনা এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

সারণী—২ : শুষ্ক প্রোটিনের সম্ভাব্য বার্ষিক ফলন (কেজি/হেক্টার)

● গোমাংস	৭৮
● মাছ (পুকুরের চাষে)	৬৭৫
● সাদা বোতাম ছাতু (Agaricus bisporus)	৬৫,০০০

(কুক, ১৯৭৭)

সুতরাং মাশরুম চাষে বিশাল পরিমাণে বহুমূল্য প্রোটিন উৎস রয়েছে, বিশেষ করে গোমাংসের জন্য গবাদি চাষ এবং পুকুরে মাছ চাষের তুলনায়।

সারণী—৩ এ মাশরুমের বহুবিধ অ্যামিনো অ্যাসিডের গঠন দেওয়া হল। যে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীর গঠনে এইসব অ্যামিনো অম্ল খুবই প্রয়োজন। প্রায় সমস্ত প্রকার ভোজ্য মাশরুমে এইসব বহুবিধ মূল্যবান প্রোটিন খাদ্যগুণ রয়েছে। তবে বিভিন্ন জাতে এর পরিমাণ ভিন্নতর। নিচের সারণীতে বোতাম ছাতুর অ্যামিনো অম্লের পরিমাণ দেওয়া হ'ল।

সারণী—৩ : সাদা বোতাম ছাতুতে অ্যামিনো অম্লের পরিমাণ (Hayes & Haddad, 1976)

অ্যামিনো এ্যাসিডস্	পরিমাণ (গ্রাম/১০০ গ্রাম শুষ্ক ছাতুতে)
● অ্যালানিন্	২.৪০
● আরজিনিন্	১.৯০
● অ্যাস্পার্টিক অম্ল	৩.১৪
● সিস্টিন্	০.১৮
● গ্লুটামিক অম্ল	৭.০৬
● গ্লাইসিন্	১.২০
● হিষ্টিডিন্	০.৬৪
● আইসোলিউসিন্	১.২৮
● লিউসিন্	২.১৬
● লাইসিন্	১.৬২
● মেথিওনাইন্	০.৩৯
● ফিনাইল অ্যালানাইন্	১.৫৫
● প্রোলাইন্	২.৫০
● সেরিন	১.৮৯
● থ্রিওনাইন্	১.৪৮
● ট্রিপ্টোফ্যান্	৩.৯৪
● টাইরোসিন্	০.৭৮
● ভ্যালাইন্	১.৬৩

বিভিন্ন অ্যামিনো অম্লের মধ্যে গ্লুটামিক অম্ল, অ্যাস্পার্টিক অম্ল, ট্রিপ্টোফ্যান্, প্রোলাইন্, অ্যালানিন্ প্রভৃতি অন্যান্য অ্যামিনো অম্লের তুলনায় খুব বেশি পরিমাণে থাকে। এগুলি সবজি-প্রোটিনের মধ্যে প্রায় নেই বললেই চলে। মাশরুম প্রোটিন তাই গুণমানে সবজি এবং প্রাণীজ প্রোটিনের মধ্যবর্তী অবস্থায় রয়েছে।

তাই নিরামিষ খাদ্য তালিকায় মাশরুম প্রোটিনের পুষ্টি বিকল্প মূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানী লিন্টজেল্ (Lintzel, 1941) তাঁর পরীক্ষায় প্রমাণ করেছেন যে, মাশরুম প্রোটিনের

সহজপাচ্যতা (digestibility) ৭২-৮৩%, যা অন্য কোনো খাদ্যে সহজে পাওয়া যায় না।

খনিজ পদার্থ (Minerals)

মাশরুমে খুব উচ্চ পরিমাণে খনিজ পদার্থ রয়েছে। পটাশিয়াম, ফসফরাস, ক্যালশিয়াম, সোডিয়ামের সঙ্গে লোহা, তামা ইত্যাদি মানুষের শরীরের হাড় এবং দাঁতের বৃদ্ধির জন্য খবুই জরুরি। অ্যান্ডারসন্ ও ফেলারস্ (Anderson & Fellers, 1942) বিজ্ঞানীদ্বয় সাদা বোতাম ছাতুর ছাই বিশ্লেষণ করে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম, ফসফরাস, তামা এবং লোহা পেয়েছেন। স্বল্প পরিমাণে ক্যালসিয়ামও তাঁরা তাঁদের পরীক্ষায় পেয়েছেন।

কার্বোহাইড্রেট্স ও ফ্যাট্স (Carbohydrates & Fats)

বিজ্ঞানী চ্যাং ও হেস্ (Chang & Hayes, 1974) তাঁদের পরীক্ষায় দেখেছেন যে, ভোজ্য মাশরুমে শর্করা ও স্নেহজাতীয় পদার্থের পরিমাণ কম থাকে। তাই এটি ডায়েবেটিক রোগীর আদর্শ খাদ্য বলে বিবেচিত। ভোজ্য মাশরুমে স্টার্চের অনুপস্থিতিই ডায়েবেটিক্ রোগীদের এই আদর্শ খাদ্যের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। যাঁরা তাঁদের বিশাল শরীরের ওজন কমাতে চান, তাঁদের পক্ষেও তাই ভোজ্য মাশরুম একটি আদর্শ খাদ্য।

সারণী—৪ এ ভোজ্য মাশরুমগুলিতে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের পরিমাণ দেওয় হ'ল।

সারণী—৪ : কতকগুলি ভোজ্য মাশরুমে খনিজ পদার্থের পরিমাণ (মিলিগ্রাম / ১০০ গ্রাম শুষ্ক ওজন)

মাশরুমের প্রকার	Ca ক্যালসিয়াম	P ফসফরাস	Fe লোহা	Na সোডিয়াম	K পটাশিয়াম
● সাদা বোতাম ছাতু (Agaricus bisporus)	২৩	১৪২৯	০.২	—	৪৭৬২
● Lentinus edodes	৩৩	১৩৪৮	১৫.২	৮৩৭	৩৭৯৩
● ধিংড়ি বা ঝিনুক ছাতু (Pleurotus ostreatus	৯৮	৪৭৬	৮.৫	৬১	—
● পোয়াল ছাতু (Volvariella volvacea)	৭১	৬৭৭	১৭.১	৩৭৪	৩৪৫৫

[Source : Chang & Hayes, 1978]

কন্নেল্ এবং অ্যাসিলিনের (Connel & Esselen, 1947) পরীক্ষা অনুযায়ী তাজা ভোজ্য মাশরুমে ০.৯৫% ম্যানিটোল (mannitol), ০.২৮% প্রশমিত চিনি (reducing sugars), ০.৫৯% গ্লাইকোজেন এবং ০.৯১% হেমিসেলুলোজ থাকে। হাঘস্ (Hughes, 1962) বলেছেন, মাশরুম লিনোলেইক্ অম্লে ভরপুর, যা ফ্যাটি অম্ল গঠনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শক্তিমূল্য (Energy Value)

আগের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়েছে যে, মাশরুম একটি অতি উচ্চ

শক্তিমূল্যযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য। হেস্ এবং হাড্ডাডের (Hayes & Haddad, 1975) মতে ৪৫৪ গ্রাম তাজা ভোজ্য মাশরুমে ১২০ কিলো ক্যালোরি তাপমান শক্তি খাদ্যগুণ রয়েছে। ওয়াট্ এবং মেরিল (Watt & Merril, 1950) ও মরগারিজের (Morgaridge, 1956) একই মতবাদ প্রকাশ পায়। ক্যানা এবং উইডোসনের (Canna & Widdowson, 1969) মতে এক পাউন্ড (৪৫৪ গ্রাম) তাজা মাশরুম সাধারণত ৩২ কিলো ক্যালোরি শক্তি জোগায়, যা অন্যান্যদের মতবাদের তুলনায় সাধারণত কম তাপশক্তি সম্পন্ন।

যাইহোক, মাশরুমের সুগন্ধ সস্ ও সুপ্ তৈরির পক্ষে খুবই ভাল। এতে ক্ষুধা বাড়ানোর গন্ধ (appetising flavour) এবং প্রয়োজনীয় প্রোটিন উৎস বর্তমান। তাই আমাদের খাদ্য তালিকায় মাশরুম আদর্শ। ভারতে যেখানে এক বিশাল জনসংখ্যা নিরামিষাশী, মাশরুম তাদের পক্ষে একটি আদর্শ সবজি জাতীয় প্রোটিন খাদ্যের উৎস, যা খুবই উচ্চ শক্তিযুক্ত এবং প্রোটিন বিকল্প রূপে প্রমাণিত।

কলকাতা তথা ভারতের মাশরুম গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন তাদের সাম্প্রতিক প্রেস রিলিজে তাজা কাঁচা মাশরুমের নিম্নলিখিত পুষ্টিকর মূল্য উল্লেখ করেছেন—

● মাশরুমের খাদ্যমূল্য ও পুষ্টিমান

—কম ক্যালোরি যুক্ত : প্রতি ১০০ গ্রামে ৩০ ক্যালোরির কম তাপমান মূল্য, মোটা লোকের রোগা হওয়ার পক্ষে আদর্শ খাদ্য।

—স্নেহ জাতীয় পদার্থ কম, কোনো কোলেস্টেরল্ নেই : সুস্থ হার্টের জন্য আদর্শ খাদ্য।

—কম কার্বোহাইড্রেট যুক্ত : প্রতি ১০০ গ্রামে ২.৫ গ্রাম, ডায়েবেটিক্ বা বহুমূত্র রোগীর আদর্শ খাদ্য।

—কম লবণ যুক্ত : প্রতি ১০০ গ্রামে ১০ মিলিগ্রাম। কম লবণ যুক্ত খাদ্য তালিকায় স্বাদের সমস্যা মেটাতে সক্ষম। রান্না করা খাদ্যে বা লবণ বিহীন খাদ্যে মাশরুম সুগন্ধি যুক্ত করে খাদ্যের গুণমান বাড়ায়।

—খনিজ পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। পটাসিয়াম প্রতি ১০০ গ্রামে ৬২০ মিলিগ্রাম, যা বয়স্ক লোকের পক্ষে এবং যাঁরা খুব হাল্কা খাবার খান, তাঁদের পক্ষে আদর্শ। এতে তামা, ফসফরাস, ফলিক অম্ল, জিঙ্ক বা দস্তা, সেলেনিয়াম প্রভৃতি খনিজ পদার্থ খাদ্যের গুণমান বৃদ্ধি করে।

—এটি খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিনের আধার। ভিটামিন বি-১, বি-২, নিয়াসিন, বি-১২ এবং সি যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

—ছিবড়া (fibre) : প্রতি ১০০ গ্রামে ৩ গ্রাম। অন্যান্য সবজি প্রোটিন অপেক্ষা মাশরুম প্রোটিন খুবই উচ্চমানের। কারণ এতে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অম্লের পরিমাণ বেশি থাকে।

সাদা বোতাম ছাতুর (Agaricus bisporus) স্থান অন্যান্য সব সবজির (বীন, মটরশুঁটি এবং মুসুর ব্যতীত) মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী, বিশেষ করে এর প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অম্লের পরিমাণের জন্য। এর ৭০-৯০% সবজি প্রোটিন খুবই সহজপাচ্য।

—নিরামিষাশীদের পক্ষে বহুমূল্য পুষ্টিকর খাদ্য। ডাল, বীন, মটরশুঁটি জাতীয় খাদ্যে মাশরুম মিশিয়ে আরো সুস্বাদু ও সহজপাচ্য এবং উপাদেয় করা যায়। অপূর্ব গন্ধ এবং গ্রথন তাদের মাংসের বিকল্পে উন্নীত করেছে।

—মাশরুম আর্থিক দিক দিয়ে মিতব্যয়ী খাদ্য। এর কোনো কিছুই বাদ যায় নাকোনো খোসা নেই, কোনো ভিটামিন রান্নার জলে নষ্ট হয় না। খুব তাড়াতাড়ি এবং সহজেই খাদ্য তৈরি করা যায়। এটি একটি খুব হাল্কা খাবার। বাজার থেকে কিনতে হলে বেশি জায়গা লাগে না, হাল্কা ওজনের বাজার।

বোতাম ছাতুর গড় ওজন : কাঁচা অবস্থায় ৫০ গ্রাম এবং রান্না করা অবস্থায় ১২৫ গ্রাম।

—এদের বহুমুখী গুণাগুণ বর্তমান। কাঁচা বা রান্না করা অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। বৃদ্ধির জন্য এর স্যুপ্ একটি ভাল খাদ্য, যা যে কোনো খাবার খাওয়ার আগে শুরু করা হয়। যে কোনো আকারে ব্যবহৃত হয়—বোতাম, বন্ধ বা খোলা কাপে অথবা বৃহদাকারে খোলা অবস্থায়।

—মাশরুম মূলত প্রাকৃতিক কম্পোস্ট, পিট এবং চকের উপর জন্মায়। সারাবছর ধরে দৈনিক মাশরুম চাষ ও ফলন প্রায় পাওয়া সম্ভব।

—তাজা ব্রিটিশ মাশরুম থেকে বিলাতি মদ তৈরি করা যায়। এতে বহুমূল্য পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়।

—কাগজের ব্যাগে রাখা যায় বা কাগজে জড়িয়ে স্যালাড্ ড্রয়ারে রেফ্রিজারেটারে রাখা যায়। তবে ফসল তোলার বা কেনার তিন দিনের মধ্যে খেয়ে নেওয়া ভাল।

—চাষ করা মাশরুম ধোয়ার দরকার নেই। জলে ধুলে এদের স্বাদ নষ্ট হবে এবং তাতে খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিনের পরিমাণ কমে যাবে। এদের খোসা ছাড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই। অথবা বোঁটা বাদ দেওয়ার দরকার নেই। সমস্ত মাশরুমই খাদ্য হিসাবে ব্যবহার্য। এর ত্বকে খাদ্যগুণ এবং সুগন্ধি থাকে। শুধু একটি ভেজা কাপড়ে মুছে নিন বা ঠাণ্ডা জলে খুব তাড়াতাড়ি ধুয়ে নিন। কাঁচা অথবা রান্নার জন্য এইভাবেই প্রস্তুত করা যায়।

—সব সময় মাশরুমের টুকরো বোঁটাসহ নিচের দিকে রেখে ধারালো ছুরি দিয়ে কাটুন। এই অবস্থায় লেবু রসের সামান্য ছিটে রঙকে রক্ষা করবে।

—সাদা মাশরুম দেখতে "বোতামের মত"। এগুলি বড় হতে দিতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিচের অংশ বন্ধ হয়। একে "closed cup" বলে। যখন খুব সূক্ষ্ম সাদা ত্বক বোঁটার চার দিকে ফাট্‌তে দেখা যাবে ও পিঙ্ক গিল্‌স দৃশ্যমান হবে, তখন তাকে "Open cup" বলে। "Open cup" মাশরুমকে আরো বড় হতে দিলে পূর্ণতা প্রাপ্তি পাবে, কালো রঙের গিল্‌স দেখা যাবে। তখন একে "large open" বলে।

—সঠিক পছন্দের মাশরুমকে প্রথমে বাছাই করে আপনার খাবার প্রস্তুত করুন।

—বোতাম ছাতু : ছোট্ট সাদা এবং ঘনভাবে আবদ্ধ থাকে। এদের একটা খুব মধুর সুগন্ধ রয়েছে। এদের হাল্কা ধূসর রঙের জন্য সস্ তৈরিতে এটি খুব উপযুক্ত। গোটা, টুকরো করে বিভিন্ন ভাবে সাজিয়ে মাশরুম ডিস প্রস্তুত করা যায়। স্যালাড্ বা রান্না করা

খাদ্য তৈরিতে এটি আদর্শ। পেঁয়াজ, রসুন আদাকুঁচি এবং অন্যান্য স্যালাড্ জাতীয় সবুজ পাতার সঙ্গে মাশরুম মিশ্রণ করা যাবে।

সারণী—৫ : তাজা / খাদ্য প্রস্তুত করা সাদা মাশরুম (প্রতি ১০০ গ্রামে গড় মূল্য)

শক্তি (energy)	১০০ কে. জে. (kj) বা ৩০ ক্যালোরি
প্রোটিন বা আমিষ খাদ্য	৩.০০ গ্রাম
ফ্যাট্ বা স্নেহজাতীয় পদার্থ	০.২০ গ্রাম
কোলেস্টেরল্	নেই
চিনি (sugar)	খুব সামান্য
ভিটামিন্স বা খাদ্যপ্রাণ—	
বি-১ (থিয়ামিন)	০.১০ মিলিগ্রাম
বি-২ (রিবোফ্লেভিন্)	০.৪০ মিলিগ্রাম
নিয়াসিন	০.৫০ মিলিগ্রাম
প্যান্টোথেনিক অম্ল	৬.২০ মিলিগ্রাম
বি-১২	০.০৫ মিলিগ্রাম
ভিটামিন-'সি'	২.০০ মিলিগ্রাম
খনিজ পদার্থ (Minerals)--	
ফসফরাস	৭৫.০০ মিলিগ্রাম
পটাশিয়াম	৬২০.০০ মিলিগ্রাম
লোহা	১.০০ মিলিগ্রাম
তামা (কপার)	১.০০ মিলিগ্রাম
লবণ	৬.০০ মিলিগ্রাম
ছিবড়া (fibre)	১.০০ গ্রাম

পঞ্চম অধ্যায়

স্পন্ বা বীজ এবং মাশরুমের বীজ উৎপাদন (Spawn and Mushroom Seed Production)

স্পন্ কাকে বলে?

গাছ জন্মাতে বীজের প্রয়োজন হয়। সেরকম মাশরুম চাষ করতে স্পনের দরকার হয়। তাই মাশরুম চাষীরা মাশরুমের নতুন চাষে বংশবিস্তারের জন্য যে বীজ ব্যবহার করেন, তাকেই স্পন্ বা মাশরুমের বীজ বলা হয়। স্পন্ হ'ল তাই মাশরুমের বীজ সমতুল্য— অন্যান্য উচ্চতর ফসলের বীজের মত। এটি একটি নির্বাচিত মাশরুমের অঙ্গজ মাইসেলিয়াম (Vegetative mycellium), যা একটি নির্দিষ্ট মাধ্যমে (medium) চাষ করা হয়ে থাকে। এই স্পন্ বা বীজ উচ্চ চাপ সম্পন্ন বাষ্প পরিশোধিত দানা শস্যের উপর কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করে নেওয়া হয়। স্পন্ পলি প্রপলিন প্যাকেটে দানা শস্যের (গম, ধান, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি) সাথে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রতি প্যাকেটে ২০০ গ্রামের বীজ রাখা হয়। মাশরুম চাষে এই দানাশস্য জাত স্পনের ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি।

স্পনের গুণমান নতুন মাশরুম চাষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মাশরুমের ফলন মূলত নির্ভর করে এই স্পনের শুদ্ধতা এবং গুণমানের উপর। সাধারণত মাশরুমের স্পন্ বা বীজ উচ্চ চাপ সম্পন্ন বাষ্প পরিশোধিত ধান, গম, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি দানাশস্য দিয়েই তৈরি করা হয়। মাশরুম চাষে স্পোর (Spore) চাষ করা হয় না। কারণ এতে গুণমান তথা ফলনের প্রচুর তারতম্য দেখা যায়।

পশ্চাৎপট আলোচনা

আগেই বলা হয়েছে, মাশরুম একটি জীবন্ত গঠন বা অবয়ব (living organism)। জীববিজ্ঞান অনুযায়ী এর নাম ছত্রাক, কিন্তু সব ছত্রাকই আবার মাশরুম নয়। বড় মাংসল ছত্রাকই সাধারণত মাশরুম। এ বিষয়ে আগেই বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। (প্রথম অধ্যায়।

মাশরুমের এই শরীর কতকগুলি কোষ নিয়ে গঠিত। এই কোষগুলি দেখতে লম্বা ফিলামেন্টের মত। এর নাম হাইফা (hyphae)। সারা পৃথিবীতে প্রায় ২০ হাজার প্রজাতির ছত্রাক বিস্তৃত। ভোজ্য মাশরুমের প্রত্যেকটি প্রজাতি চাষ করতে হলে আগে জানা দরকার মাশরুমের স্পন্ তৈরির কলাকৌশল বা পদ্ধতি। মাশরুমের এই বীজ উৎপাদন পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে বর্তমানে অতি সহজ প্রযুক্তির সাহায্যে এবং খুব কম খরচে মাশরুমের চাষ জনপ্রিয় হচ্ছে। এখন খুব কম খরচে মাশরুমের স্পন্ তৈরি করাও সম্ভব হচ্ছে। এখন দুটি বোতাম ছাতু (Agaricus species : *A. bisporus* এবং *A.*

bitorquis), দুটি ঝিঁঝিড়ি বা ঝিনুক ছাতু (Oyster বা Pleurotus species : *P. sajor-caju* এবং *P. citrinopileatus*) এবং দুটি পোয়াল ছাতুর (Paddy-straw বা Volvariella species : *V. displacia* এবং *V. volvacea*) চাষ খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এখন তাই মাশরুম চাষীদের নিজের স্পন নিজেকেই তৈরি করে নিতে হবে। উদ্বৃত্ত স্পন বিক্রয় করে অপরের প্রয়োজনও মেটানো যায়। এর জন্য বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। নিচে তাই মাশরুমের স্পন্ বা বীজ তৈরির পদ্ধতি বিশদভাবে আলোচনা করা হ'ল।

দানাজাত স্পন্ বা মাশরুমের বীজ উৎপাদন পদ্ধতি

● ধান, গম, জোয়ার বা বাজরার দানাগুলি প্রথমে ভালভাবে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে হবে।

● এরপর দানাগুলি আধঘন্টা ধরে গরম জলে সেদ্ধ করে নিতে হবে।

● সেদ্ধ হওয়ার পর জল ছেঁকে ফেলে দিতে হবে।

● প্রতি ২০০ গ্রাম দানাশস্যে ১.৩ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং ০.৩ গ্রাম ক্যালসিয়াম সালফেট গুঁড়ো ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।

● রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো ২০০ গ্রাম গম ৫০০ মিলিলিটার খালি দুধের বোতলে বা খালি স্যালাইন বোতলে, কিংবা ১০" x ৪", ৮" x ৫" বা ৯" x ৬" মাপের পলি প্রপলিন প্যাকেটে ভরে নিতে হবে এবং তুলোর ছিপি দিয়ে বোতল বা পলি প্যাকেটের মুখ ভাল করে বন্ধ করে দিতে হবে (চিত্র নং ৬)।
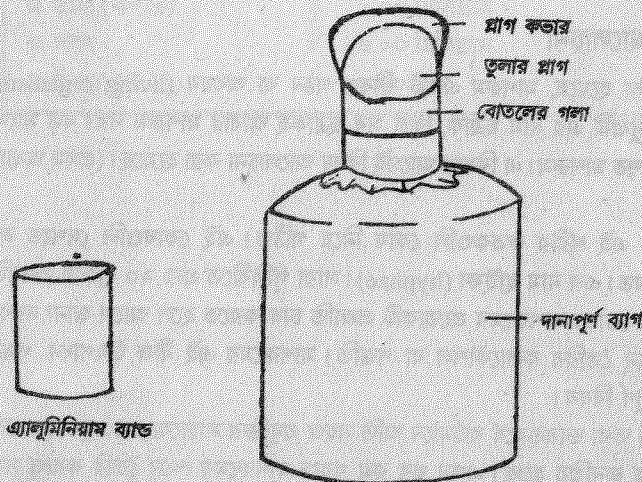
চিত্র : ৬. স্পন্ তৈরির জন্য পলিপ্যাক।

● বোতল বা পলি প্যাকেটে ১৫ পাউণ্ড চাপ সম্পন্ন বাষ্পে এক ঘন্টা পরিশোধিত করার ২৪ ঘন্টা পর আবার একবার পরিশোধন করতে হবে।

● ঠাণ্ডা হওয়ার পর কালচার মিডিয়াম জাত মাশরুম ছত্রাকের জালিকার একটি টুকরা নিয়ে বোতল বা পলি প্যাকেটের দানাশস্যের সাথে যোগ করতে হবে।

● বোতল বা পলি প্যাকেটগুলি চাষযোগ্য বিভিন্ন ছত্রাকের প্রজাতি অনুযায়ী আলাদা করে চিহ্নিত করতে হবে।

● ১৫-২০ দিনের মধ্যে মাশরুমের স্পন্ বা বীজ তৈরি হয়ে যাবে। এই স্পন্ বা বীজ নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় (১০° সেলসিয়াস ± ১) রাখলে ২-৩ মাস ভালভাবে ব্যবহারের উপযোগী থাকবে।

প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম

সুরক্ষিত রসায়নাগার (ল্যাবোরেটরী), রেফ্রিজারেটর, বৈদ্যুতিক পাখা ও আলো, টেবিল, চেয়ার, প্রেশার কুকার, কেরোসিন স্টোভ বা হীটার, রড্ সহ সূচ, চিমটা, তারের খাঁচা, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাপার জন্য থার্মোমিটার, ওজনের জন্য তুলাযন্ত্র, কাঁচি, ছুরি, চালুনি, কাঁচের সিরিঞ্জ (২০ মিলি.) কাঁচের টুকরো, টেবিল গ্লাস, মাপার জন্য মেজারিং চোঙ (৫০০-১০০০ মি.লি.), কালচার টিউব (১৫ সেমি x ১০ সেমি), বিকার (২৫০-১০০০ মি.লি.), স্পিরিট জার, পিপেট্ বা সূচী নল, খালি স্যালাইনের বোতল, স্পিরিট ল্যাম্প, কোনিকেল ফ্লাস্ক, পেট্রিডিস (১০ সেমি.-ঢাকনা সমেত), নন্-অ্যাব্জরবেন্ট শুকনো তুলা, ওয়াশ বোতল, অগার, ডেক্সট্রোজ বা গ্লুকোন-'ডি', ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, ক্যালসিয়াম সালফেট, মেথিলেটেড্ স্পিরিট (১০% অ্যাল্কোহল), মারকিউরিক ক্লোরাইড, অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপসুল (২৫০ মি.গ্রা.), পলি পপলিন প্যাকেট (৪০-৫০ গেজ মাপের), গ্লাস-মারকিং রঙিন পেন, প্লাষ্টিক জলের মগ, মেটাল বালতি, ওয়াশিং ব্রাশ, রাবারের গার্ডার, ওয়াশিং পাউডার, ফিনাইল, ডেটল, মেটাল রিং, কটন রোপ, সস্প্যান (ঢাকনাসহ), ডেক্চি (ঢাকনাসহ), হাতা, ছানতা, কাঠের ষ্ট্যান্ড, ট্রে বা বারকোষ, এ্যালুমিনিয়াম বাল্তি, কালো পলিথিন কাগজ, কেরোসিন তেল, গম, আলু, ঝাঁটা, দেশলাই, পুরাতন খবরের কাগজ, গামছা, ফানেল, মোমবাতি, নাইলনের দড়ি, নাইলন জালের ব্যাগ, সুতলি দড়ি, খড় (ধানের), খড়কাটার জন্য বড় বঁটি, বাঁশের ঝুড়ি, খালি চটের বস্তা, মেটাল ঝুড়ি, ষ্টীলের আলমারি, চামচ প্রভৃতি।

মাশরুম চাষের বীজ তৈরি ও অন্যান্য গবেষণার জন্য সংরক্ষিত রসায়নাগার বা ল্যাবোরেটরি

এর জন্য দরকার একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বড় মাপের পাকা ঘর। এই ঘরের মধ্যে আর একটি ১০' x ৫' ফুট মাপের ঘর তৈরি করে নিতে হবে। এই ঘরকে আবার দু'ভাগে ভাগ করতে হবে। ঘরের মধ্যে প্রবেশ পথে বিপরীত মুখী দুটি দরজা রাখা দরকার। এই

ঘরে একটি চেয়ার ও কাঁচ ঢাকা টেবিল থাকা প্রয়োজন। রসায়নাগারে বিভিন্ন কাজ করার পর লেখালেখির জন্য এই ব্যবস্থা করতে হবে।

প্লাগ প্রস্তুত প্রণালী

মাশরুম বা ছত্রাকজাত উদ্ভিদের মিডিয়ামজাত কালচার এবং স্পন্ জন্মানোর জন্য টেস্টটিউব, পলি-প্রপলিন্ প্যাকেট ও বোতলের মুখ আটকাবার জন্য যে ছিপি বা কর্ক ব্যবহার করা হয়—সব মিলিয়ে তাকে প্লাগ প্রস্তুত প্রণালী বলে। প্লাগ তৈরি করার জন্য সাধারণ মানের তুলো ব্যবহার করা উচিত নয়। এজন্য নন্-অ্যাবজরবেন্ট তুলো ব্যবহার করা হয়।

সাধারণত চার ধরনের প্লাগ প্রস্তুত করা হয়— **(১) কালচার টিউব প্লাগ, (২) রিং প্লাগ, (৩) ইন্জেক্ট প্লাগ এবং (৪) বোতল প্লাগ।**

কালচার টিউব ও ইনজেক্ট প্লাগ তৈরি করতে ৩০-৪০ মিলিগ্রাম তুলা নিয়ে আলতোভাবে চাপ দিয়ে পাকিয়ে তাকে সমান ভাবে ভাগ করে কালচার টিউবের মুখে লাগাতে হয়। ইনজেক্ট করার জন্য পলি-প্রপলিন প্যাকেটে সুতা বা রাবারের গার্ডার দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। **রিং ও বোতল প্লাগ** তৈরি করতে আগের মত একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এতে তুলার পরিমাণ একটু বেশি লাগবে। এর আকার একটু বড় হয়। কালচার টিউবের মুখের ব্যাস $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি এবং রিং ও বোতলের মুখের ব্যাস ১" ইঞ্চি হয়।

মিডিয়াম ও মিশ্রণ প্রণালী

সাধারণত চার প্রকারের মিডিয়াম হয় এবং এদের মিশ্রণ প্রণালী ভিন্নতর **(১) পি. ডি. এ. মিডিয়াম, (২) তরল মিডিয়াম, (৩) দানাশস্যজাত মিডিয়াম ও (৪) খড়জাত মিডিয়াম।**

এদের উপকরণ ও প্রস্তুত প্রণালী নিম্নরূপ—

পি. ডি. এ মিডিয়াম : এর তৈরির জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন, তা হ'ল—খোসা ছাড়ানো আলু, ডেক্স্ট্রোজ বা গ্লুকোন 'ডি', অগার এবং অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপ্সুল বা ক্লোরোমাইসিটিন।

এই মিডিয়াম ১ কেজি (১০০০ মিলিলিটার) তৈরি করতে ২০০-২৫০ গ্রাম আলু সেদ্ধর জল, ২০ গ্রাম অগার, ২০ গ্রাম ডেক্সট্রোজ বা গ্লুকোন 'ডি' লাগবে। আলুগুলি সেদ্ধ হওয়ার সময় যাতে না ফাটে সেভাবে কাটতে হবে। সেদ্ধ হওয়ার সময় জলের পরিমাণ এমন হবে যাতে আলু সেদ্ধ হওয়ার পর ১০০০ মিলি লিটারই থাকে। এবার আলুসেদ্ধ জল ছাঁকনিতে ছেঁকে মেজারিং চোঙে মেপে নিতে হবে। মাপ করা আলু সেদ্ধ জলে প্রথমে অগার মিশিয়ে গ্লাস রড্ দিয়ে ভাল করে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে, যাতে অগার আলুসেদ্ধ জলে ভালভাবে মিশে যায়। একটু ঠাণ্ডা হলে ডেক্সট্রোজ বা গ্লুকোন 'ডি' ও অ্যান্টিবায়োটিক

ক্যাপসুল (ক্লোরোমাইসিটিন ২৫০ মি. গ্রা.) ভাল করে মিশিয়ে পিপেট দিয়ে কালচার টিউবের মধ্যে ৫-৬ মিলি লিটার দিয়ে তুলোর তৈরি প্লাগ দিয়ে টিউবের মুখ আটকে দিতে হবে।

তরল মিডিয়াম : যন্ত্রপাতি ও প্রস্তুত প্রণালী পি. ডি. এ মিডিয়ামের মত। এক্ষেত্রে কেবল কালচার টিউবের পরিবর্তে কনিক্যাল্ ফ্লাস্ক বা স্যালাইনের খালি বোতল, কাঁচের টুকরো ও অগার বাদ দিতে হবে। তাছাড়া গ্লুকোন 'ডি' ও অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপসুল মিশ্রিত আলুসেদ্ধ জল ব্যবহার করতে হবে। কনিক্যাল্ ফ্লাস্কে ৭০-৮০ মিলিলিটার ও স্যালাইন বোতল হলে ৩০০ মিলিলিটার তরল মিডিয়াম দিয়ে তুলোর তৈরি প্লাগ দিয়ে মুখ আটকাতে হবে।

দানাশস্য জাত মিডিয়াম : পরিমাণমত গম ও জল ডেক্‌চিতে নিয়ে স্টোভ বা হিটারে সেদ্ধ করতে হবে। গম যাতে সিদ্ধ হয়ে গলে বা ফেটে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এবার ছানতা দিয়ে ছেঁকে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। এরপর ছায়াতে পরিষ্কার কাগজে টেবিলের উপর বিছিয়ে সামান্য শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর প্রতি ২০০ গ্রাম গমে ১.৩ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও ০.৩ গ্রাম ক্যালসিয়াম সালফেট মিশিয়ে পলিপ্রপলিন প্যাকেটের মধ্যে ভরে টিনের তৈরি রিং লাগিয়ে তুলার প্লাগ দিয়ে মুখ আটকাতে হবে। অথবা ৫০০ মিলিলিটার খালি দুধের বোতলে ভরা হয় এবং মুখ তুলার প্লাগ দিয়ে আটকে দিতে হবে। নিড্‌ল মেথডের জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সিরিঞ্জ মেথডের জন্য পলিপ্রপলিন প্যাকেটে তুলার প্লাগ লাগিয়ে সুতো বা রাবারের গার্ডার দিয়ে প্যাকেটের মুখ বাঁধতে হবে। এছাড়া স্যালাইন বোতলে সেদ্ধ গম ভরে কর্ক দিয়ে মুখ আটকিয়ে দানাশস্যজাত মিডিয়াম প্রস্তুত করা যায়।

পরিশোধন

খালি কালচার টিউব ও বোতল ভালভাবে পরিশোধন করা দরকার। এতে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকারক ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস হবে। সেজন্য খালি কালচার টিউব ও বোতল পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে শুকনো করে কাগজ জড়িয়ে প্রেশার কুকারের মধ্যে দিয়ে প্রথম সিটি পড়ার ১৫ মিনিট রেখে তুলে নিতে হবে।

পি ডি এ ও তরল মিডিয়াম পরিশোধন

কালচার টিউব এবং বোতল পরিশোধন করার পদ্ধতি অনুসরণীয়। কেবল পি ডি এ মিডিয়াম পরিশোধন করার পর তরল অবস্থায় তুলে নিয়ে কালচার টিউবের যে দিকে তুলার প্লাগ লাগানো থাকে, সেদিক পাতলা দণ্ডের উপর রেখে ঢাল প্রস্তুত করা হয়।

দানাশস্য মিডিয়াম পরিশোধন

একই পদ্ধতি অনুসরণীয়। শুধু সময়ের পার্থক্য রয়েছে। বোতল বা পলিপ্রপলিন প্যাকেট ১৫ পাউন্ড ১২১° সে. চাপসম্পন্ন বাষ্পে এক ঘন্টা পরিশোধন করার পর আবার

একপ্রকার এক ঘন্টা পরিশোধন করতে হবে। তা নাহলে সম্পূর্ণভাবে ব্যাকটেরিয়ামুক্ত হবে না।

ইনোকুলেশন ঘর পরিশোধন

১০% মিথিলেটেড স্পিরিট দিয়ে ঘরের মধ্যে ব্যবহারিক যন্ত্রপাতিগুলি শোধন করা দরকার। ইনোকুলেশন পদ্ধতি হ'ল যে পদ্ধতিতে ইনোকুলেশন ঘরের যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়ে নিড্‌ল বা সিরিঞ্জের সাহায্যে এক কালচার টিউব বা বোতল থেকে পৃথক মিডিয়াম টিউব বা বোতলে স্থানান্তর করা হয়।

বিভিন্ন প্রকার স্পন্

(১) কুমারী স্পন্ (Virgin spawn–ফ্রান্সে প্রথমে ব্যবহৃত হয়), (২) ফ্লেক স্পন্ (স্তুপিকাকৃত কণিকাবৎ স্পন্), (৩) ইট স্পন্ (Brick spawn–ঘোড়ার সার ও গোবর সার দোআঁশ মাটিতে মিশিয়ে ইটের মত ৩ সেমি পুরু কেক প্রস্তুত করা হয়), (৪) গোবর স্পন্ (Dung spawn–আগে ঘোড়ার গোবর বা তামা ডাঁটা কম্পোস্ট মিডিয়ামে কেক প্রস্তুত হতো। এখন এটি আর ব্যবহার হয় না), (৫) জৈবসার স্পন্ (Manure spawn–খুব খারাপভাবে প্রস্তুত কম্পোস্টের জন্য এই স্পন্ তৈরি করা হয়), (৬) দানাশস্যজাত স্পন্ (grain spawn–গম, ধান, ভুট্টা, বাজরা ইত্যাদি দানা দিয়ে এই স্পন্ তৈরি হয়। এখন মাশরুম চাষে এই স্পনের প্রায় সর্বত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়), (৭) পারলাইট স্পন্ (Perlite spawn–পারলাইট খনিজ পদার্থ দিয়ে ১৯৭১ সালে লেম্‌কি এই পদ্ধতি প্রবর্তন করেন দানা স্পনের মতই এটি প্রস্তুত করা হয়) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার স্পনের মধ্যে দানাশস্যজাত স্পন্ সবথেকে বেশি জনপ্রিয়ভাবে ব্যবহার হয়।

দানা স্পনের সুবিধা

—এটি খুব সহজেই করা যায়, বিশেষ করে ট্রে-বা বারকোষ পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিতে মজুরি কম লাগে।

—এতে দানা স্পনের রান্ খুব দ্রুততর হয় এবং মাশরুম চাষীরা স্বল্প দিনেই উৎপাদন শুরু করতে পারেন।

অসুবিধা

—'গ্রিন মোল্ড' বা 'সবুজ মোল্ড' রোগে সহজে আক্রান্ত হতে পারে।

—বোতল থেকে কালচার বের করার পর বেশি দিন রাখা যায় না এবং পরিবহনে বিশেষ তাপমাত্রা সংরক্ষিত না থাকলে অসুবিধা দেখা দেয়।

—হিমঘরে দীর্ঘদিন রাখা যায় না।

—ইঁদুর দানা খেয়ে নষ্ট করে।

—অন্য স্পনের ন্যায় দানা স্পন্ প্রতিকূল অবস্থায় বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না।

স্পন্ নির্বাচনের গুণাবলী

(১) ভাল স্পনে বেশি উৎপাদন হয়। সিল্কের মত ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়া জাত সব থেকে ভাল। কিছু দিনের পর 'মা-কালচারের' গুণাবলী পুরোপুরি থাকে না। রেফ্রিজারেটরে (৪° সে. তাপমাত্রার নিচে) রাখা কালীন তাদের পরীক্ষা করা দরকার।

পোয়াল ছাতুর ক্ষেত্রে মাইসেলিয়াম বৃদ্ধি খুব বেশি হয় এবং ছোট্ট ইট-রঙের গাঁটগুলি (knots বা ক্যালামাইডোস্পোরস্) পরে দেখা দিতে শুরু করে। যত বেশি গাঁট হবে, তত বেশি ফলন হবে।

(২) মিডিয়াম বা মাধ্যমটি খুব ঘন স্পনের বৃদ্ধিতে ঢাকা থাকতে হবে।

(৩) মোল্ড বা অন্যান্য ভাইরাসজনিত রোগ থেকে স্পন্‌গুলি মুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৪) বৃহত্তর ফলনের জন্য ভালজাতের স্পন্ নির্বাচন দরকার।

স্পন্ সংরক্ষণ (Storage of Spawn)

ভালভাবে স্পন্ সংরক্ষণ না করলে, ফলন ব্যাহত হবে। জৈব স্পন্ পদ্ধতিতে যদি স্পন্ ২° সে. তাপমাত্রায় ৬৮, ১২৮ এবং ২০৬ দিন যথাক্রমে রাখা যায়, তাহলে স্পনের উৎপাদন ক্ষমতা যথাক্রমে শতকরা ৫, ৬ এবং ৮ ভাগ কমে যাবে (হেত্‌লে, ১৯৫৯)। ধিংড়ি ছাতুর ফলন দেখা গেছে প্রায় সমানই হয়, যদি ২ মাস ধরে ঘরের তাপমাত্রায় বা রেফ্রিজারেটরে স্পন্ রাখা হয়। স্যান্ এন্টোনেও এবং হায়াং (১৯৭১) লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, যে কোনো জাতের স্পন্ ২ বছর ধরে সংরক্ষণ করেও ফলন কমেনি।

সাধারণত স্পনের ট্রেগুলি কাগজে ঢাকা দিয়ে পর পর উপরে উপরে রাখা যাবে। ঐ সময় ঘরের তাপমাত্রা ২২°-২৫° সে. হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা না হলে স্পন্ রান (Spawn run) ব্যাহত হবে। বারকোষ বা ট্রের কাগজের ঢাকনার উপর যখন প্রয়োজন হবে, জল দিতে হবে। এইভাবে উপযুক্ত পদ্ধতিতে স্পন্ সংরক্ষণ করে সর্বোত্তম মাশরুম উৎপাদন করা খুবই সম্ভব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাশরুম চাষের পূর্ব শর্তাবলী (Pre-requisites of Mushroom Cultivation)

অন্যান্য মাঠ ফসল চাষের সঙ্গে মাশরুম চাষের সাদৃশ্য নেই। এই চাষে বিশেষ কার্যকারিতা এবং ভালভাবে সাহায্য লাভ করতে হলে ভাল প্রযুক্তিগত বিদ্যার জ্ঞান এবং বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকার মাশরুম চাষের সঠিক চাহিদা আগে জানতে হবে। সাধারণত মাশরুম চাষের প্রযুক্তিকে চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

(১) স্পন্ বা বীজ তৈরি এবং তাদের সংরক্ষণ।

(২) মাশরুম চাষের জন্য উপযুক্ত কম্পোস্ট তৈরির কৌশল।

(৩) মাশরুম চাষের জন্য উপযুক্ত ঘর বা জায়গা বাছাই, নির্মাণ ও উন্নতিসাধন এবং

(৪) বীজবোনা, কেসিং ও ফসল পরিচর্যা।

বিভিন্ন জাতের মাশরুম চাষ প্রযুক্তি বিভিন্ন ধরনের। বাণিজ্যিকভাবে মাশরুম চাষের জন্য এই বিশেষ প্রযুক্তি সম্বন্ধে আগে জ্ঞানলাভ করা দরকার। ভালভাবে ধ্যানধারণা না থাকলে হুট্‌হাট করে এই ফসল চাষে এগনো ঠিক নয়।

স্পন্ বা বীজ তৈরীর ব্যাপারে আগের অধ্যায়ে (প্রথম) বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে তাই কম্পোস্ট তৈরি এবং চাষপদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

● কম্পোস্ট তৈরি

সঠিক কম্পোস্ট তৈরি মাশরুম চাষের একটি প্রধান বিষয়, বিশেষ করে বোতাম ছাতুর চাষে। ৭ নং চিত্রে জৈবিক বর্জ্য পদার্থের পচনে কিভাবে সেলুলোজ বেস তৈরি উন্নত
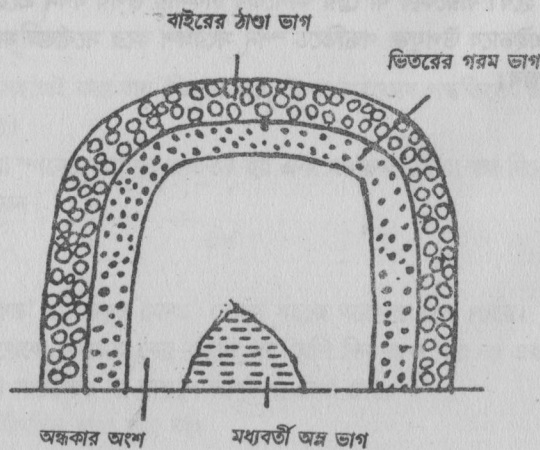
চিত্র : ৭. কম্পোস্ট হিপ্ (প্রস্থচ্ছেদ দৃশ্য)।

উপায়ে করা হয় (বোতাম ছাতু), তা দেখানো হয়েছে। সাদা বোতাম ছাতু চাষের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত কম্পোস্টের গুণাগুণ যেসব কারণের উপর নির্ভর করে, তা হ'ল—

(১) মূল কাঁচামালের প্রকৃতি,

(২) ব্যবহার্য জৈবিক এবং অজৈবিক পদার্থ, এবং

(৩) কম্পোস্ট তৈরিতে এদের পরিচর্যা।

কম্পোস্ট এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে এর প্রাকৃতিক গঠন যথেষ্ট বাতাস চলাচলে সাহায্য করবে, জলধারণ ক্ষমতা থাকবে, অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে, রাসায়নিকভাবে এর পি এইচ (অম্লত্ব-ক্ষারত্ব মাপকাঠি) যথাযথ হবে, যাতে অ্যামোনিয়া গ্যাস জমা হবে না এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হ'ল, প্রয়োজন ভিত্তিক উদ্ভিদখাদ্য (nutrients) মাশরুম বৃদ্ধিতে জোগান দেওয়া।

কাঁচামাল (Raw materials)

ঐতিহ্যগতভাবে ভারতে গম, ধান, ভুট্টা, বাজরা প্রভৃতির খড় হ'ল প্রাথমিক কাঁচামাল। পোয়াল বা খড় খুব নরম, তাড়াতাড়ি পচে ও ছিবড়া থাকে না। কম্পোস্ট তৈরিতে এর প্রাকৃতিক গঠন খুবই উপযোগী। এক বছরের পুরানো ধানের খড়, যা বৃষ্টিতে ভেজেনি—মাশরুম চাষের জন্য খুবই ভাল। খড়ের বিচালি ৮-১০ সে. মি. (৩-৪ ইঞ্চি) করে কাটা হয়, ভালভাবে বাতাস চলাচলের জন্য। খুব ছোট বিচালি জড়ো করলে বাতাস চলাচল কম হবে। এতে অবায়বীয় পচন (anaerobic fermentation) বেশি হবে, যা মাশরুম চাষের পক্ষে ক্ষতিকর।

সম্পূরক বস্তু (Supplements)

মূল কাঁচামালে নাইট্রোজেন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু যথেষ্ট পরিমাণে থাকে না, যা পচনের পদ্ধতিগত কাজে সাহায্য করে। এইসব কাঁচা মালে তাই প্রাণীজ জৈবসার, যথা—ঘোড়ার গোবর বা পোলট্রিসার বা গুড় (molasses), আলুর বর্জ্য পদার্থ বা প্রাণীজ খাবার, এমনকি রাসায়নিক সার—নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং/বা পটাশিয়াম ঘটিত সার মেশানো দরকার। এ ছাড়া জিপসাম বা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও কম্পোস্টে যুক্ত করা দরকার। এতে কম্পোস্টের পি. এইচ. নিরপেক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। গ্রামবাংলায় বা ভারতের গ্রামাঞ্চলে তাই খুবই কম খরচে এইসব কাঁচামাল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। শুধু এলাকা অনুযায়ী এদের সহজলভ্যতা এবং খরচ নির্ভর করে।

সূত্র (Formulations)

মাশরুম চাষে কম্পোস্ট তৈরির কোনো নির্দিষ্ট সূত্র নেই। ভারতে বিভিন্ন বিজ্ঞানী তথা মাশরুম বিশেষজ্ঞরা এলাকা ভিত্তিক সহজলভ্যতার উপর বিভিন্ন কম্পোস্টের ব্যবহার সূত্র নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সাদা বোতাম মাশরুম চাষে কৃত্রিম কম্পোস্ট তৈরির জন্য তিনটি মূল সূত্র এখন ব্যবহার করা হচ্ছে। মূলত এটি হ'ল খড়, কার্বোহাইড্রেট জাতীয় পদার্থ (গমের ভূষি), পোলট্রি লিটার এবং রাসায়নিক সার। এদের পরিমাণগত

ব্যবহার নিম্নরূপ—

ধান বা গমের গড় ৩০০ কেজি, গমের ভূষি ১৫ কেজি, পোলট্রি সার ২৫০ কেজি, ইউরিয়া ২.৫ কেজি, সিঙ্গল্ সুপার ফসফেট ৭.৫ কেজি, পটাশিয়াম সালফেট বা মিউরেট অফ্ পটাশ ৩ কেজি, ৫০ কেজি কাঠের গুঁড়ো, এবং জিপসাম ৩০ কেজি, ৬ কেজি ক্যান্সার (ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট)।

ধান বা গমের খড় (বিচালি) ৩-৪ ইঞ্চি (৮-১০ সেমি) লম্বা করে কাটতে হবে। তার আগে পুকুর বা চৌবাচ্চায় পরিষ্কার জলে বিচালিকে ১০-১৫ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। ভেজা খড় পুকুর বা চৌবাচ্চা থেকে তুলে পাটাতনের উপর এমনভবে রাখতে হবে, যাতে জল ভাল করে ঝরে যায়। খড় শুধু ভেজা অবস্থায় থাকবে। এবার ওই ভেজা খড় খোলা জায়গায় পাকা মেঝের উপর ৮-১০ ইঞ্চি (২০-২৫ সেমি) উঁচু করে স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। প্রতিটি স্তরে একহাত ভেজা কাঠের গুঁড়োর সাথে গমের ভূষি, ক্যান্সার, ইউরিয়া, সিঙ্গল্ সুপার ফসফেট, পটাশিয়াম সালফেট বা মিউরেট অব্ পটাশ, পোলট্রি সার, ইত্যাদি ভালভাবে মিশিয়ে সমানভাবে ছড়াতে হবে। এসময় জিপসাম দেওয়ার দরকার নেই। জিপসাম পরে দিতে হবে। এভাবে সাজানো খড়ের গাদাতে তাড়াতাড়ি পচন ক্রিয়া শুরু হয়। ৩-৪ দিনের মধ্যে খড়ের গাদার ভেতরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫°-৭০° সে. পর্যন্ত হয়ে যায়। তখনই বুঝতে হবে কম্পোস্ট তৈরির কাজ ঠিকমত চলছে। ২৮-৩০ দিনের মধ্যে কম্পোস্ট তৈরি হয়ে যায়। এই সময়ের মধ্যে ৫-৬ বার কম্পোস্টের স্তর উল্টেপাল্টে দেওয়া দরকার। সব থেকে নিচের স্তর উপরে এবং উপরের স্তরকে নিচে নামিয়ে দিতে হবে। প্রতিটি স্তরের ৮ ইঞ্চি পরিমাণ ধারের খড়কে মাঝখানে ঠেলে দিতে হবে। খড় সাজানোর ৬ দিন পর প্রথমবার এবং ১০ দিন পর দ্বিতীয়বার এইভাবে উল্টেপাল্টে দিতে হবে। তারপর ১-২ দিন অন্তর একবার করে উল্টে দিতে হবে। তৃতীয়বার উন্টানোর সময় জিপসাম মেশানো দরকার। এরপরে কিন্তু কম্পোস্টের গাদায় আর জল দেওয়া যাবে না। তার আগে প্রয়োজন মত জলের ছিটা দিতে হবে। এইভাবে ২৮-৩০ দিন থাকার পর কম্পোস্টের রঙ গাঢ় বাদামী দেখাবে এবং এতে ঝাঁঝালো অ্যামোনিয়ার গন্ধ থাকবে না। যদি এই গন্ধ পাওয়া যায়, তাহলে আর ৩-৪ দিন অপেক্ষা করলে গন্ধ দূর হবে। আলগা করে স্তর সাজানো খুবই প্রয়োজন। বেশি চাপ দিলে বাতাস চলাচল বন্ধ হয়ে কম্পোস্টের রঙ কালো হয়ে যাবে। একটা পচা দুর্গন্ধও পাওয়া যাবে। এরূপ কম্পোস্টের তখন আর মাশরুম চাষে কোনো প্রয়োজন হবে না। হাতের তালুতে চাপ দিলে যদি কম্পোস্ট থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে, তাহলে আর কিছু পরিমাণ জিপসাম মেশাতে হবে। এতে অতিরিক্ত জল শোষিত হয়ে যাবে। তাই আন্দাজমত এবং প্রয়োজনমাফিক জিপসামের পরিমাণ ঠিক করতে হবে। এইভাবে মাশরুম চাষের জন্য আদর্শ কম্পোস্ট তৈরি করে নিতে হবে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাই কম্পোস্ট তৈরির ফর্মূলা তৈরি করতে হবে।

কম্পোস্ট তৈরির পদ্ধতি (Composting Methods)

দু'ধরনের পদ্ধতি রয়েছে—(১) দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতি (Long method) এবং স্বল্পস্থায়ী

পদ্ধতি (Short method)। প্রথম পদ্ধতি খুব পুরনো। এতে ২০-২৮ দিন সময় লাগে। দ্বিতীয়টিতে ১৬-২০ দিন সময় লাগে। দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতিতে খরচ কম। এই পদ্ধতি এখনো সারা ভারতে বেশ কিছু মাশরুম চাষী ব্যবহার করে থাকেন।

কম্পোস্ট তৈরিতে যেসব ধরনের সহজলভ্য জৈব পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তাদের প্রাকৃতিক কম্পোস্ট বলে। তখন কম্পোস্টের মূল অংশ ঘোড়ার গোবর থেকে নেওয়া হতো। কিন্তু যখন কাঁচামালের মূল অংশ খড় থেকে নেওয়া হয়, তাকে কৃত্রিম কম্পোস্ট (Synthetic compost) বলা হয়।

তৎসত্ত্বেও দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরিতে অনেকগুলো অবস্থার মধ্যে খড় ভেজানো (৭৫%), জিপসাম ছাড়া অন্যান্য দ্রব্য/সম্পূরক বস্তু মেশানো, যথাযথ আকারের স্তূপ (heap) তৈরি করা এবং উন্টানো ইত্যাদি কাজগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত এই স্তূপগুলি ১ মিটার লম্বা, ১ মিটার চওড়া এবং প্রয়োজনমত আকারের তৈরি করা হয়। এই কাজে কম্পোস্ট প্রস্তুতিতে নিম্নলিখিত তালিকা গ্রহণ করা হয়—

- প্রথম বা ০ দিনে : ভেজানো, বিভিন্ন সম্পূরক দ্রব্য মেশানো এবং জড়ো করা।
- চতুর্থ বা ৪ দিনে : প্রথমবার উন্টানো।
- অষ্টম বা ৮ দিনে : দ্বিতীয়বার উন্টানো।
- দ্বাদশ বা ১২ দিনে : তৃতীয়বার উন্টানো।
- ষোড়শ বা ১৬ দিনে : চতুর্থবার উন্টানো।
- বিশ বা ২০ দিনে : শেষবার উন্টানো এবং তারপর ট্রেগুলিতে ভর্তি করা।

নাইট্রোজেন দ্রব্যাদি ও কার্বোহাইড্রেট সম্পূরক দ্রব্যাদি ভেজা খড়ে ভাল করে মেশানো হয়—জড়ো বা স্তূপীকৃত করার আগে ০ দিনে, জিপসাম তৃতীয়/চতুর্থবারে উন্টানোর সময় এবং প্রয়োজনানুসারে ছত্রাকঘটিত ঔষধ শেষবার উন্টানোর সময় মেশানো দরকার।

এই দীর্ঘস্থায়ী কম্পোস্ট প্রস্তুতিতে কিছু অসুবিধা রয়েছে, যেমন—যেহেতু এটি ঘরের বাইরে প্রস্তুত করা হয়, যেকোনো রোগ জীবাণুর সংস্পর্শে আসতে পারে। এটা দূর করার জন্য স্বল্পস্থায়ী কম্পোস্ট পদ্ধতি ভাল। এতে কম দিনে ভাল গুণমান সম্পন্ন কম্পোস্ট প্রস্তুত করা যায়। এই পদ্ধতিতে দুটো প্রধান অবস্থা রয়েছে—অবস্থা ১ ও ২ (Stage–I এবং Stage–II)।

প্রথম অবস্থার বাইরে ৮ দিনের জন্য কম্পোস্ট প্রস্তুতিতে রাখা হয়। তারপরই পাস্তুরাইজেশন্ এবং কম্পোস্টের কন্ডিশনিং (Stage–II) বাতাস চালিত নিষিক্ত ঘরের ভেতর (insulated room with steam circulation) করা হয়।

'পাস্তুরাইজেশন্' দুটো উদ্দেশ্য সাধন করে—(১) অ্যামোনিয়াকে অনুজীবী প্রোটিনে (microbial protein) রূপান্তর করে এবং (২) অনুজীবী সংক্রমণ ধ্বংস করে। স্বল্পস্থায়ী পদ্ধতিতে Stage–I এর কার্যসূচী নিম্নরূপ—

- ০ দিন : ভেজানো, সম্পূরক দ্রব্য মেশানো এবং জড়ো করা (stacking)।
- ২ দিন : প্রথম উন্টানো (turning)।

● ৪ দিন : দ্বিতীয় উল্টানো ও জিপসাম যুক্ত করা।
● ৬ দিন : তৃতীয় উল্টানো।
● ৮ দিন : ট্রেগুলিতে কম্পোস্ট ভর্তি করা—পাস্তুরাইজেশনের জন্য।

বারকোষ বা ট্রের মধ্যে কম্পোস্ট ভর্তি করার পরই পাস্তুরাইজেশান্ করা যেতে পারে, শিখর তাপ বা (peak heating)। অথবা একটি সুড়ঙ্গের (tunnel) মধ্যে একটি পাকা পোক্ত অপরিবাহী ঘরেতে কম্পোস্ট উল্টানো হয়। পাস্তুরাইজেশনের জন্য প্রথমে স্টিম বা গরম বাতাস পাস্তুরাইজ করা ঘরে বায়বীয় অবস্থায় প্রবাহিত করা হয়। এতে তাপসহনকারী অনুজীবী (thermophillic microflora)র যথাযথ বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং তারপরই এ্যামোনিয়া অনুজীবী প্রোটিনে রূপান্তরিত হয়।

বারকোষ বা ট্রে-পাস্তুরাইজেশন্ পদ্ধতিতে ট্রেগুলিতে আল্‌গাভাবে কম্পোস্ট ভরতে হয় এবং একটার উপর আর একটা পর পর সাজানো থাকে। যাতে একটা ট্রে থেকে আর একটা ট্রের মধ্যে ২০ সেমি ফাঁক থাকে। এটা পাস্তুরাইজ রুমের মধ্যে ভালভাবে বাতাস চলাচলের জনই প্রয়োজন। একটি ২৪′ x ১৫′ x ১২′ আকারের ঘরে প্রায় ২৫০টি ট্রে রাখা যাবে। সর্বোচ্চ তাপের সময় ঘরের তাপমাত্রা ৪৮°-৬০° সে. এর মধ্যে হওয়া চাই। ৪৮°-৫২° সে. তাপমাত্রায় শুরু করে প্রায় ২-৪ দিন এই অবস্থায় রেখে, পরে তাপমাত্রা ৫৮°-৬০° সে. এ বৃদ্ধি করে ৪ দিন রাখা হয় এবং তারপর ৪৮°-৫২° সে. তাপামত্রায় কমিয়ে এনে ৪ দিন ধরে এরূপ রাখতে হয়। এসব স্টিমের জোগান নিয়ন্ত্রণ করে। এতে কম্পোস্ট অ্যামোনিয়া মুক্ত হয়। তারপরে তাপমাত্রা ২৪°-২৫° সে. তে কমিয়ে এনে বাতাস চলাচল এবং স্পন্ প্রস্তুতের উপযোগী করে তোলা হয়।

বাল্ক পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতিতে ঘরের মধ্যে 'সুড়ঙ্গ' বা 'বাল্করুম' তৈরি করে কম্পোস্ট ভর্তি করা হয়। তাপমাত্রা ৫৭°-৫৮° সে. এ বৃদ্ধি করা হয় এবং ১০-১২ ঘন্টা এরূপ অবস্থায় রেখে আবার তা ৪৮°-৫২° সে. তাপমাত্রায় ৪-৫ দিন নামিয়ে আনা হয়। এরূপ কম্পোস্ট কন্ডিশনিং-এর পর তাপমাত্রাকে পুনরায় ২৫°-৩০° সে. তাপমাত্রায় নামিয়ে এনে সুড়ঙ্গে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। এতেই স্পন তৈরির জন্য কম্পোস্ট প্রস্তুত পদ্ধতি সম্পূর্ণ হয়।

ভাল কম্পোস্টের বৈশিষ্ট্য

(১) দেখতে কালো-বাদামী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
(২) আঠালো হওয়া চলবে না।
(৩) অ্যামোনিয়ার গন্ধ থাকা চলবে না।
(৪) একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ পাওয়া যাবে।
(৫) জলীয় মাত্রার পরিমাণ ৬৮-৭০% থাকতে হবে। হাত দিয়ে চাপ দিলে কিছু জলীয় দ্রবণ বেরিয়ে গেলে বুঝতে হবে স্যাঁৎসেঁতের (dampness) লক্ষণ। কিন্তু কম্পোস্ট দানাগুলি পরস্পর আঁকড়ে থাকবে।

মাশরুম উৎপাদনের ঘর

বাণিজ্যিকভাবে যেহেতু মাশরুমের চাষ ঘরের ভিতর হয়, তাই মাশরুম চাষের জন্য বিভিন্ন ধরনের এবং আকারের ঘর বানানো জরুরি। সাধারণত মাশরুম চাষের জন্য ঘরটির উচ্চতা কমপক্ষে ৩ মিটার (১০′) উঁচু হওয়া দরকার। প্রয়োজনমত লম্বা ও চওড়া হবে। জানালায় সূক্ষ্ম তারের জাল লাগাতে হবে। এতে মাছি, পোকামাকড়ের প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। বাতাস চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। তবে মাটির ঘরে, এমনকি উপযুক্ত বাতাস চলাচল ব্যবস্থাযুক্ত গাড়ি গ্যারেজ, যে কোনো পরিত্যক্ত ঘরেও ভালভাবে মাশরুম চাষ করা যাবে। যেকোনো ঘরেই সোজাসুজি সূর্যালোক এবং তাপমাত্রার ঘনঘন পরিবর্তন কিছুতেই হওয়া চলবে না। মাশরুম চাষের সময় ঘরের তাপমাত্রা সাধারণত ২০° সে. এর বেশি হওয়া চলবে না। বেশি আর্দ্রতাও মাশরুম চাষের পক্ষে ভাল নয়। তাই একথা সবসময় মনে রাখতে হবে যে, উচ্চ আর্দ্রতা এবং খারাপ বায়ু চলাচলকর পরিস্থিতিতে মাশরুম চাষ ভাল হবে না। এ ছাড়া বিভিন্ন জায়গা ও পরিস্থিতিতে মাশরুম চাষে জলের ভাল সরবরাহ ব্যবস্থা থাকা জরুরি। ঘরের আবহাওয়া স্যাঁতসেতে হওয়া চলবে না।

● পোয়াল ছাতু চাষের প্রযুক্তি

পোয়াল ছাতু চাষ সাধারণত ঘরের বাইরে খড়ে জন্মায়। খুব কম খরচে অতি সহজে এই ছাতুর চাষ করা হয়। এতে অন্য ছাতুর মত তৈরি কম্পোস্ট লাগে না। দরকার শুধু আ-পচা (unrotten) ধানের খড় বা বিচালি বা পোয়াল। স্পন্ খড়ে প্রয়োগ করার ১৫ দিনের মধ্যেই ফসল পাওয়া যায়।

গমের খড়, আখমাড়াইয়ের পর আখের ছিবড়া (bagasse), শুকনো কলাপাতা বা যেকোনো জৈব বর্জ্য পদার্থের উপরওপোয়াল ছাতু চাষের চেষ্টা করা হয়েছে। দেখা গেছে, খড়ের বিচালির উপরই সব থেকে ভালমানের এই ছাতুর ফলন বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়।

এক বছরের কম পুরানো ধানের খড় বা বিচালি, যা ছাওয়া জায়গায় রাখা হয়, বৃষ্টিতে ভেজে না, এরূপ ২০-২৫ সেমি ব্যাসার্ধের ৩২ আঁটি (৫০ কেজি) এনে, একটা জলের ট্যাংকে প্রায় ২৪ ঘন্টা ভেজাতে হবে। তারপর অতিরিক্ত জল বের করে খড়গুলির আঁটি বাঁধতে হবে। মাশরুমের বেড় বা বিছানাগুলি সাধারণত ১০০ সেমি x ১০০ সেমি x ১০০ সেমি বা ১০০ কিউবিক সেমি হতে হবে। একটা বাঁশের মাচার উপর ঘন করে একটাঁর সঙ্গে আর একটা এরূপ খড়ের আঁটি পরপর বিপরীতভাবে সাজাতে হবে। কতগুলি স্তরে খড় সাজাতে হবে, তা নির্ভর করবে খড়ের লম্বা কতখানি (ধরা যাক ৯০-১০০ সেমি), তার উপর। এইভাবে প্রথম স্তর তৈরি করা হয়। এবার স্পন্‌গুলি খড়ের বাণ্ডিলের ধার থেকে ৭-১০ সেমি ভেতরে সর্বত্র ছড়াতে হবে। স্বল্প পরিমাণ ছোলা বা অড়হরের আটা স্পনের উপর ছড়াতে হবে। তারপর দ্বিতীয় সারির খড়ের আঁটি প্রথম স্তরের উপর সমকোণে বিছাতে হবে এবং একই ভাবে তার উপর স্পন্ ছড়াতে হবে। এই তৃতীয় স্তর

বিছিয়ে তার উপর একইভাবে স্পন্ ছড়ানো যাবে এবং তার উপর খুব আলগাভাবে খড় বিছাতে হবে। বিছানার বাইরে বেরিয়ে আসা খড় কেটে দেওয়া দরকার। এইভাবে প্রস্তুত খড়ের বিছানাতে সাধারণত ৪৫০-৫০০ গ্রাম দানা স্পন্ লাগবে। খুব অল্প পরিমাণে অ্যামোনিয়াম সালফেট বা ইউরিয়া এবং সিঙ্গল্ সুপার ফসফেট বেড়ের উপর ছড়ালে মাশরুমের বৃদ্ধি ভাল হবে। এইভাবে বিছানা প্রস্তুত শেষ হলে, উপরে হাল্কাভাবে একটা পলিথিন চাদর চাপা দিন। এতে যথাযথ আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হবে। স্পন্ ছড়ানোর পর প্রথম ৩-৪ দিন জল দেওয়ার দরকার নেই। ৭-১০ দিন বাদে যখন ছাতুর মাথাগুলি বেরিয়ে আসতে দেখা যাবে, তখন পলিথিনের চাদর সরিয়ে দিতে হবে। ৪-৫ দিন ধরে ফসলটি বোতাম-অবস্থায় থাকে। যখন ছাতুর উপরের ভালভ্ ফাটা ফাটা হতে দেখা যাবে, তখনই ফসল তোলার উপযুক্ত সময়। মনে রাখতে হবে, ১৪-১৫ দিনের মাথায় এরূপ পোয়াল ছাতুর সব থেকে বেশি ফলন পাওয়া যায়। ফসল তোলার পর জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখলে সপ্তাহ খানিক পরে অল্প পরিমাণ ছাতু পাওয়া যায়। এক মাসের বেশি কোনো খড়ের স্তূপ রাখা উচিত হবে না। এগুলি ফেলে দিয়ে নতুন গাদা বানাতে হবে।

বিছানা পদ্ধতিতে (Bed method)

এরূপ চাষ ছাড়া পলিথিন ব্যাগের মধ্যেও এই ছাতুর চাষ করা যায়। এরজন্য দরকার ছোট ছোট বিচালি এবং কাগজের ছোট ছোট টুকরা, যা একসঙ্গে ২৪ ঘন্টার জন্য জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। অতিরিক্ত জল ছেঁকে এবার স্পন্ ভাল করে মিশিয়ে ফুটো ফুটো করা পলিথিনের প্যাকেটে ভরতে হবে। ব্যাগের মুখ ভাল করে বেঁধে ৩৫°-৪০° সে. তাপমাত্রায় রাখতে হবে। এবার আধারের অসুবিধা না করে ব্যাগ কেটে দিতে হবে এবং দিনে ২-৩ বার জল স্প্রে করতে হবে, যাতে ৮০-৯০% আর্দ্রতা বজায় থাকে। এই পদ্ধতির পর পিনের মাথার আকৃতির ফলন্ত ছত্রাক শরীর ১০-১৫ দিনে বেরিয়ে আসতে দেখা যাবে। ১৫ দিনের মাথায় ছাতু তোলা যাবে। ছাতুর মাথা পুরো খুলে যাওয়ার আগেই তা তুলে নিতে হবে। তোলার ২৪ ঘন্টার মধ্যে রান্না করা উচিত।

ভাল ফসলের উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

পোয়াল ছাতুর উত্তম ফলন বৃদ্ধিতে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি বর্ণনা করা হ'ল—

(১) **বিছানা বা স্তরের আকার (Size of bed)** : এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছোট ছোট বেডগুলি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। বড় বড় বেড বা বিছানাযুক্ত পোয়াল ছাতু চাষে উপযুক্ত সর্বোত্তম তাপমাত্রা সুরক্ষিত হয়, বিশেষ করে মাশরুম বৃদ্ধির সময়। সাধারণভাবে বিছানার আকৃতি ১ মিটার x ১ মিটার x ১ মিটার অথবা ০.৫ মিটার x ০.৫ মিটার x ০.৫ মিটার হলে দেখা গেছে, মাশরুমের ভাল বৃদ্ধি এবং ফলন বেশি পাওয়া যায় (চিত্র ৮ ও ৯)।
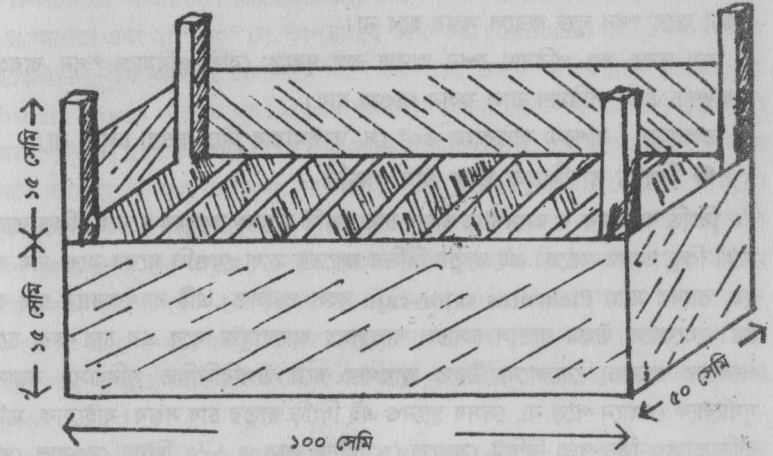
চিত্র : ৮. মাশরুম ট্রে বা বারকোষ।
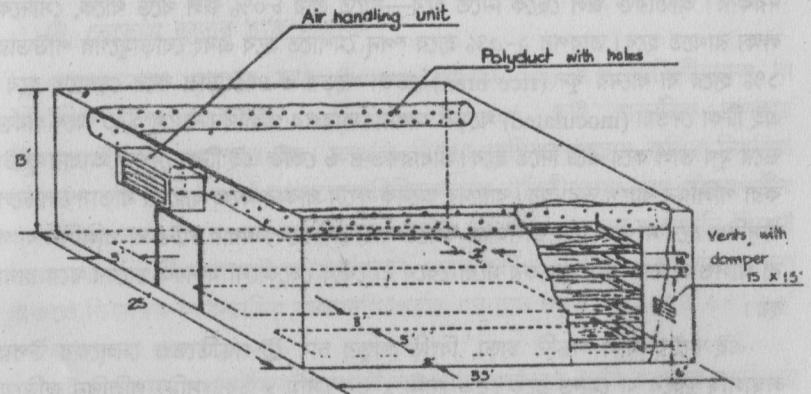
চিত্র : ৯. মাশরুম চাষের ঘর।

স্পনের মাত্রা এবং দূরত্ব : সাধারণত প্রতি বর্গ মিটার বিছানা বা স্তরের জন্য ৩৫০-৪০০ গ্রাম দানা স্পন্ সর্বোত্তম। প্রতিস্তরে স্পনের মাত্রা যুক্ত হওয়ায় ফলন বেশি হয়, যা একটা স্তরে স্পন যুক্ত করলে সম্ভব হবে না।

কম দূরত্ব স্বল্প পরিমাণ স্পন্ অথবা কম দূরত্বে বেশি পরিমাণে স্পন্ ব্যবহারে সাধারণত একই পরিমাণ ভাল ফলন পাওয়া যায়।

তাপমাত্রা : মাশরুম বৃদ্ধিকালে ৩০° সে. তাপমাত্রার নিচে হওয়া চলবে না।

● ধিংড়ি বা ঝিনুক ছাতু চাষ পদ্ধতি

ধিংড়ি বা ঝিনুক বা অয়েস্টার ছাতুর চাষ পদ্ধতি অনেক রকমের রয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু তফাত আছে। এই ছাতুর বিভিন্ন জাতের মধ্যে যেগুলি ঘরের মধ্যে চাষ করা হয়, তাদের মধ্যে **Pleurotus sajor-caju** বহুল প্রচলিত। এটি ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়। যেকোনো উত্তম বাতাস চলাচল ব্যবস্থাসহ আলোযুক্ত ঘরে এর চাষ করা চলে। পাকাঘর ছাড়াও, যেকোনো উন্নত জায়গার ঘরে উপরিলিখিত সুবিধাসহ সরাসরি সূর্যালোক যেখানে পড়ে না, সেসব স্থানেও এই ধিংড়ি ছাতুর চাষ সম্ভব। যাইহোক, মাটির বাড়ি হলেও তিন-থাক্ বিশিষ্ট সেল্‌ফে (১ মিটার লম্বা ও ১/২ মিটার দেওয়াল থেকে দূরে) এই মাশরুম চাষ করা হয়।

বিভিন্ন প্রকার সেলুলেজিক জৈবিক বর্জ্য পদার্থ, যেমন—দানাজাতীয় ফসলের খড়, খড়ের কম্পোস্ট, কলাপাতা, তুলার বর্জ্য পদার্থ ইত্যাদিতেও ধিংড়ি ছাতু চাষ করা চলে। কিন্তু বিচালি বা ধানের খড়ে সব থেকে ভালভাবে চাষ হয়। ধিংড়ি ছাতু চাষীদের তাই ধানের খড়ই সবথেকে বেশি ব্যবহারযুক্ত জৈবিক মিডিয়াম।

৪-৫ সেমি করে খড়ের ছাতু কেটে সারারাত জলে ভেজাতে হবে। রোগ-পোকার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে কাটা খড়গুলি ফোটানো জলে প্রায় ২ ঘন্টা ডোবানো দরকার। অতিরিক্ত জল ছেঁকে নিতে হবে—যাতে প্রায় ৮০% জল খড়ে থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তারপর ২-৫% হারে স্পন্ মেশাতে হবে এবং ঘোড়ামুগের পাউডার ১% হারে বা ধানের খুদ (rice bran) ভেজা খড়ের ৩-৪% ভাল করে মেশাতে হবে। এই টিকা দেওয়া (inoculated) খড়ের আধার। তারপর পলিথিন ব্যাগে ২/৩ অংশ পর্যন্ত ভরে মুখ ভাল করে এঁটে দিতে হবে। সাধারণত ৪-৬ কেজি এই টিকা দেওয়া আধার ফুটো করা পলিথিন ব্যাগে ভরা হয়। ব্যাগের অনেক ফুটো থাকার ফলে ব্যাগের বাতাস চলাচলে অসুবিধা হবে না এবং এর তাপমাত্রা কমতে সাহায্য করবে। এবার চটের বা পলিথিন ব্যাগ বা থলিগুলি তাক্ বা সেলফের মধ্যে রেখে বা বেঁধে যেকোনো মাশরুম চাষের ঘরে রাখা হয়।

এই চটের থলি পদ্ধতি ছাড়া, ধিংড়ি ছাতুর চাষ ট্রে-পদ্ধতিতেও সেল্‌ফের উপর লম্বালম্বি রেখে বা মোল্ড ব্লকে (৫০ সেমি x ৩০ সেমি x ১৫ সেমি) পলিথিন জড়িয়ে চাষ করা যায়। সত্যি কথা বলতে কি, মাটির ভাঁড়ে, কাঠের বাক্সে প্রথমে কাগজ বিছিয়েও ধিংড়ি ছাতুর চাষ করা যায়। ৩০-৩৫ দিনে ছাতু বেরোতে শুরু করে।

ব্লক পদ্ধতিতে মাশরুম চাষ

টিকাদেওয়া আধারগুলি (inoculated) আগে বলা হয়েছে) এবার চাষ ঘরে ৮০-৮৫% আর্দ্রতা এবং ২৫°-৩০° সে. তাপমাত্রায় তা দেওয়া (incubate) হয়। ১২-১৫ দিনে মাইসেলিয়াল্-বৃদ্ধি আধারে ভালভাবে মিশে যায় এবং জমাট আধার ব্লকে (Compact substrate block) পরিণত হয়। এরপর পলিথিন ঢাকনা কেটে তা সরিয়ে নিতে হবে। এবার স্পন্-রান্ ব্লকগুলি তাক্ বা সেল্‌ফে সাজিয়ে রাখতে হবে। চাষ ঘরের আর্দ্রতা বজায় রাখতে মাঝেমধ্যেই জল স্প্রে করা দরকার। ব্লকগুলি ভেজা চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। তবে ব্লকগুলি স্পর্শ করা চলবে না। দু সপ্তাহ বাদে পিনের মাথার ন্যায় ফলন্ত ছাতুগুলি ক্রমশ দেখা দিতে শুরু করবে। এগুলি ক্রমশ খাঁজকাটা মাথা নিয়ে পূর্ণতা লাভ করবে। প্রথম ফসল কাটার পর ৭-১০ দিনের পর দ্বিতীয় ফসল তৈরি হয়ে যাবে। এইভাবে ৪-৫ সপ্তাহের মধ্যে ৩-৪টা ফসল পাওয়া যাবে। তবে ক্রমশ ফলন কমবে। ফসল সব উঠে যাবার পর, ব্যবহৃত আধারকে অন্য ফসল চাষে মাঠে জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

এছাড়া ধিংড়ি বা ঝিনুক ছাতুর চাষ মাটির বেডেও (soil beds) করা যাবে। এক্ষেত্রে মাটির বেডের উপর ১-১.২৫ সেমি পুরু খড়ের স্তর বিছাতে হবে। মাশরুমের ভাল বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য রাসায়নিক সার (NPK) খড়ের নিচে এবং স্পনের উপরিভাগে দেওয়া যাবে। সার দেওয়ার পর ভেজা খড় ১-১.২৫ সেমি পুরু স্তরে ঢেকে দিতে হবে। তার উপর গুঁড়ো মাটির একটা হাল্কা স্তর ঢাকনা (Casing) হিসাবে দেওয়া ভাল। আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা বজায় রেখে অন্যান্য পদ্ধতিতে ধিংড়ি বা ঝিনুক ছাতুর চাষ করা যাবে। ধিংড়ি ছাতুর চাষ তাই যে কোনো জায়গায় করা যায়। তবে সরাসরি সূর্যালোক, তাপ এবং বৃষ্টির জল থেকে বাঁচার জন্য চালা বা ছাউনি থাকতে হবে।

● বোতাম ছাতুর চাষ পদ্ধতি

যেহেতু সাদা বোতাম ছাতু (button mushroom) হ'ল নাতিশীতোষ্ণ বা পরিমিত তাপমাত্রার ছাতু (temperate fungus), তাই স্বাভাবিক অবস্থায় শীতকালেই এর চাষ ভাল হয়। সম্প্রতি বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃত্রিম নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ সৃষ্টি করে বিশাল আকারে বাণিজ্যিকভাবে নাতিশীতোষ্ণ এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকায়ও সারা দেশে এর ব্যাপক চাষ হচ্ছে। বিদেশে এই ছাতুর রপ্তানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি স্বভাবতই অন্যান্য ছাতুর থেকে তাই দামী ছাতু। এরাজ্যের সমতল অঞ্চলে ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত এর চাষ সম্ভব। সাধারণত ১৪°-২৫° সে. তাপমাত্রা দরকার।

এই ছাতু চাষে পাস্তুরাইজড্ কম্পোস্ট স্বল্প স্থায়ী পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়। এবিষয়ে আগেই বিশদ আলোচনা হয়েছে। এই ছাতু চাষে তাই প্রাথমিক খরচ বেশ ব্যয়বহুল এবং জটিল। তবুও এই ছাতু চাষে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে (পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল

প্রদেশ, দিল্লি প্রভৃতি) সাধারণ ঘরে দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরি করে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পোয়াল ছাতু বা ধিংড়ি ছাতুর চাষ থেকে এই ছাতুর চাষ একটু ভিন্নতর। বোতাম ছাতুর চাষে প্রথম এবং প্রাথমিক গুরুত্ব হ'ল কম্পোস্ট তৈরি।

বোতাম ছাতুর চাষ পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের। এদের নিচে বর্ণনা দেওয়া হ'ল।

(১) তাক্ বা সেলফ্ পদ্ধতি (Shelf System) : বাঁশের তৈরি বিশেষ ফ্রেম বা কাঠামোর সাহায্যে সেল্‌ফগুলি তৈরি করা হয়। র‍্যাকের উপর পলিথিন চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়। কম্পোস্টে স্পন্ দেওয়ার পর ১০-১৫ সেমি (৪"-৬") পুরু স্তরে বিছিয়ে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে স্পন্ দেওয়া এবং ফসল চাষ একই ঘরে সম্পন্ন হয়। সাধারণত ৮০-৯০ দিন মোট সময় লাগে ফসল তুলতে।

(২) ট্রে বা বাক্সকোষ পদ্ধতি (Tray System) : এই পদ্ধতিতে ১০০ সেমি x ৫০ সেমি x ১৫ সেমি সাইজের ট্রেগুলিতে কম্পোস্ট ভর্তি করা হয়। তারপর স্পন্ দেওয়া এবং একটার উপর আর একটা ট্রে এমনভাবে সাজানো হয়, যাতে দুটোর ট্রের মাঝে ১৫ সেমি ফাঁক থাকে। কাঠের ট্রে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়, যাতে ১৫ সেমি মাপের সূচালো পায়া (Pegs) চার কোণে লাগানো থাকে।

আর একটা পদ্ধতিতে বিনা পায়ায় ট্রেগুলি প্রস্তুত করা হয়, যাতে প্রত্যেক ট্রেতে ২০-৪০ কেজি কম্পোস্ট ধরানো যায় এবং সেল্‌ফগুলিতে সাজানো থাকতে পারে। ট্রেগুলিতে স্পন্ দেওয়া কম্পোস্ট দেওয়ার পর এগুলি কাগজ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, জল স্প্রে করা হয় এবং স্পন্-বৃদ্ধি ঘরে ২২°-২৫° সে. তাপমাত্রায় রাখা হয়। স্পন-রানের ১০-১৫ দিন বাদে ট্রেগুলিতে ঢাকনা দেওয়া হয় ও ফসল চাষের ঘরে রাখা হয়। খরচ বেশি বলে আজকাল এই পদ্ধতিতে আর উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে না। তাছাড়া এতে সংক্রমণের সুযোগও বেশি থাকে।

(৩) থলি পদ্ধতি (Bag System): সারা ভারতে এই পদ্ধতি এখন খুব জনপ্রিয় হচ্ছে। এটি খুবই সস্তায় করা যায় এবং বাইরের সংক্রমণের ভয় থাকে না।

স্পন্-রানের জন্য পলিপ্যাকগুলির মুখ বন্ধ করে দেওয়ার ফলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ কম হয়। ৩৫" x ২৫" সাইজের ১৫০ গজ মোটা পলিপ্যাকে প্রায় ১৫-২০ কেজি কম্পোস্ট ধরানো হয়। পাঁচ-তালা বিশিষ্ট সেল্‌ফগুলিতে এবার থলিগুলি সাজিয়ে রাখা হয়। এই পদ্ধতিতে ৪-৫টি ফসল প্রায় ৭০ দিনের মধ্যেই নেওয়া সম্ভব হয়।

উন্নত বংশ (Improved strain)

বড় বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি বোতাম ছাতুর ফসল চাষে উন্নত বংশের বীজ ব্যবহার করে অধিক ফলনে ব্রতী হয়েছে। আগের এস-২ (S-II) জাত এখনো ছোট চাষীরা ব্যবহার করছেন, বিশেষ করে দীর্ঘস্থায়ী কম্পোস্ট তৈরিতে। তবে এখন টি. এম.-৭৬ জাতটির ভাল চাষ হচ্ছে। বড় চাষীরা কম্পোস্ট তৈরিতে স্বল্পস্থায়ী পদ্ধতি ব্যবহার করে সাধারণ শংকর জাতের হর্স্ট ইউ-৩ (Horst U-3) জাত ব্যবহার করে ভাল ফসল পাচ্ছেন। টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে স্পন্ উৎপাদন করছেন বড় চাষীরা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে এই ক্ষেত্রে।

স্পন্ মেশানোর পদ্ধতি ও মাত্রা (Spawning Methods and Rate of Spawning)

স্পন্ বা বীজকে কম্পোস্টের সঙ্গে মেশানোর পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কম্পোস্টের সঙ্গে ভালভাবে বীজ মেশানো খুবই জরুরি, যাতে সমানভাবে বীজ ছড়িয়ে যেতে পারে। এতে ফলনের তারতম্য নির্ভর করে। বিভিন্ন এই মিশ্রণ পদ্ধতি নিম্নরূপ—

(১) স্পট্ স্পনিং (Spot spawning) : দানা স্পন্ বা বীজ কম্পোস্টের উপরিভাগ থেকে ৫ সেমি গভীরে নিচে গর্ত তৈরি করে ২০-২৫ সেমি দূরত্বে রাখা হয়। পরে এই গর্তগুলি কম্পোস্ট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

(২) সারফেস্ বা টপ্ স্পনিং (Surface or Top Spawning) : এই পদ্ধতিতে কম্পোস্টের উপরে প্রথমে বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তা ৩-৫ সেমি গভীর পর্যন্ত কম্পোস্টের সঙ্গে মেশানো হয়। অনেক সময় উপরে বীজ ছড়ানোর পর একটা হাল্কা কম্পোস্টের স্তর ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

(৩) স্তর বা লেয়ার স্পনিং (Layer Spawning) : এই পদ্ধতিতে কম্পোস্টের ৩-৫ সেমি গভীরে বীজ রাখা হয়, বিশেষ করে যখন ট্রেতে ভর্তি করা হয়। শেষ স্তরটি কম্পোস্টের উপরিভাগে দেওয়া হয় এবং সারফেস্ স্পনিং পদ্ধতির ন্যায় মেশানো হয়।

(৪) সুপার স্পনিং (Super Spawning) : একে কার্যকরী মাইসেলিয়াম স্পনিং (Active mycellium spawning) বলা হয়। এই পদ্ধতিতে পরিপূর্ণ বীজযুক্ত কম্পোস্টের ট্রেগুলি স্পন্ মেশানোর কাজে পুনরায় পাস্তুরাইজড্ কম্পোস্ট ট্রেতে ভরা হয় এবং তারপর শক্তভাবে প্যাক্ করা হয়। এরূপ একটি স্পন্-রান্ ট্রেকে অন্যান্য ট্রের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে কার্যকরী মাইসেলিয়াম বৃদ্ধি ভাল হয়। তবে সংক্রমণের ভয়ও রয়েছে।

(৫) মিশ্র স্পনিং (Mixed Spawning) : এই পদ্ধতিতে বীজগুলি পুরো কম্পোস্টের সঙ্গে ট্রে-ভর্তি করার সময় খুব ভাল করে মেশানো হয়।

এই সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে মিশ্র স্পনিং সব থেকে বেশি ফলন দেয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। তারপর স্তর লেয়ার স্পনিং খুবই কার্যকরী।

স্পনিং এর মাত্রা ছত্রাক বা মাশরুম চাষের শেষ ফলনে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। প্রাথমিকভাবে সর্বোত্তম বীজ মেশাতে হয়, কম্পোস্টের তাপমাত্রাকে ঠিক রাখতে। দ্বিতীয়তঃ দামী দানা-স্পনের সাশ্রয় করে খরচ কমাতে সাহায্য করে। ৫০০-৭০০ গ্রাম বীজ ১০০ কেজি কম্পোস্টে ব্যবহার করা বিধেয়।

কেসিং বা আবরণ (Soil Casing)

সফল বোতাম ছাতু চাষে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বা প্রয়োজনীয় বিষয়। কেসিং হ'ল কম্পোস্টের আবরণ, যা ঝুরঝুরে পাতলা মাটির স্তর বা মাটির মত স্তর দিয়ে স্পন্-

রানের পর করতে হয়। এই সময় ছত্রাকের মাইসেলিয়াম সম্পূর্ণভাবে কম্পোস্টের ভেতর প্রবেশ করে এবং সর্বত্র সমানভাবে সাদা ঢাকনা তৈরি করে। এটাই স্পন্-রান সম্পূর্ণ কিনা তা সূচিত করে। ২ সপ্তাহ সময় লাগে এটা হতে।

কিছুটা বাধার সৃষ্টি না থাকলে মাশরুম ভালভাবে ফলন দেয় না। কেসিং বা আবরণ এই কাজটা ভালভাবে করে, যা প্রায় সম্পূর্ণরূপে খাদ্য বিহীন অবস্থায় থাকে। এই বাধা মাইসেলিয়াম বৃদ্ধি রোধের জন্য দরকার। এতেই মাশরুমের ফলন্ত শরীর অঙ্কুরোদ্গমে সাহায্য করে। এছাড়া অন্যান্য যেসব কারণের জন্য কেসিং দরকার, তা নিম্নরূপ—

(১) এটি মাশরুমের যথাযথ বাসাবাঁধার কাজ করে।

(২) উপযুক্ত আর্দ্রতা বজায় রাখতে বাষ্পীভবন কমিয়ে কেসিং ভীষণ সাহায্য করে।

(৩) বীজ-কম্পোস্ট তাড়াতাড়ি যাতে না শুকিয়ে যায়, কেসিং সেই কাজটি করে।

(৪) কেসিং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

(৫) অনেক অপ্রকৃত শ্রেণীর ব্যাক্টেরিয়ার (Pseudomonas group of bacteria) বৃদ্ধিতে কেসিং সাহায্য করে, যার ফলে মাশরুমের শরীর বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

তাই আদর্শ কেসিং বা আবরণ দ্রব্যগুলির নিম্ন গুণাগুণ থাকা বাঞ্ছনীয়—

(১) ভাল জলধারণ ক্ষমতা।

(২) ভাল বাতাস চলাচল ব্যবস্থা।

(৩) জল দিলে মাটির গ্রথন এবং গঠন পাল্টানোর ক্ষমতা।

(৪) এটি নিরপেক্ষ বা সামান্য ক্ষারধর্মী হওয়া উচিত।

(৫) যেকোনো অপচনশীল জৈবিক পদার্থ থেকে মুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৬) বাইরের সংক্রমক জীবাণু থেকে মুক্ত থাকা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

কেসিং দ্রব্য (Casing Material)

কেসিং দ্রব্যগুলিতে অবশ্যই কোনো পুষ্টিগুণ থাকবে না। তাদের প্রাকৃতিক গুণাগুনই সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চুনে পীট মাটি মিশ্রণ করে পশ্চিমের দেশগুলিতে সাধারণত আবরণ দ্রব্য প্রস্তুত করার চল আছে। ভারতে এঁটেল-দোঁআশ মাটির (Clay loam soil) সঙ্গে পচা কম্পোস্ট মিশিয়ে কেসিং দ্রব্য হিসাবে বোতাম ছাতু বা মাশরুম চাষে ব্যবহার করা হয়। ব্যবহৃত কম্পোস্ট কমপক্ষে এক বছরের জন্য শুকিয়ে গুঁড়ো করে চালুনি দিয়ে ছেঁকে তাতে ২০-৪০% এঁটেল দোআঁশ মাটি মিশ্রণ করে কেসিং হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যদি এটি অম্লভাবাপন্ন হয়, তাহলে গুঁড়াচুন মেশাতে হবে। ১-২ সপ্তাহ পরে এতে পি. এইচ. ৭.৫ হয়ে যাবে।

কেসিং দ্রব্য পাওয়ার উপর নির্ভর করে নিচের যেকোনো একটি দ্রব্য ব্যবহার করা যাবে—

(১) ১-২ বছরের পুরনো গুঁড়া গোবর এবং মাটির সমান অংশ মিশ্রণ।

(২) ব্যবহৃত কম্পোস্ট, সুপাচ্য গোবর এবং এঁটেল, দোআঁশ মাটির ২:১:১ অনুপাতে মিশ্রণ।

(৩) ১ বছরের পুরনো ব্যবহৃত কম্পোস্ট, বালি এবং চুনের ৪:১:১ অনুপাতে মিশ্রণ।

(৪) বাগানের মাটি এবং বালির মিশ্রণ (৪:১ অনুপাতে)।

কেসিং মিশ্রণের পরিচর্যা

এই মিশ্রণে রোগ-পোকার জীবাণু ধ্বংসের জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য বা পাস্তুরাইজেশন্ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ২% ফরম্যালিন্ দিয়ে কেসিং মিশ্রণ দ্রব্য ভাল করে ধৌত করা, পলিথিন প্যাকেটে ভরে ২ সপ্তাহ রেখে দেওয়া ইত্যাদিতে একাজ করা যাবে। ব্যবহারের সময় কোনোরূপ ফরম্যালিন্ থাকা চলবে না। তা হলে মাশরুম মরে যাবে। ছোট মাশরুম চাষীরা এভাবে কেসিং মিশ্রণ দ্রব্য পরিচর্যা করতে পারেন।

বড় বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যেখানে পাস্তুরাইজেশন্ পদ্ধতির সুবিধা রয়েছে, সেখানে কেসিং মিশ্রণ দ্রব্য জীবাণুমুক্ত গরম বাতাসের (৬৫°-৭০° সে. তাপামাত্রায় ৭-৮ ঘন্টার জন্য) সাহায্যে করা দরকার। ক্ষতিকর নিমাটোড্ ধ্বংস হবে এতে। তবে বন্ধু ব্যাক্টেরিয়াগুলি মেরে ফেলা ঠিক হবে না। এগুলি মাশরুম ফলন বৃদ্ধিতে প্রভূত সাহায্য করে থাকে।

কেসিং পদ্ধতি

কেসিং মিশ্রণ খুব বেশি শুকনো বা ভেজা হওয়া চলবে না। সামান্য স্যাঁৎসেঁতে হলেই হবে। হাতের তালুতে চাপ দিলে এই মিশ্রণ যাতে একসঙ্গে জমাট বাঁধে, কোনো প্রকার জলীয় পদার্থ নিষ্ক্রমণ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কেসিং এর জন্য থলি পদ্ধতিতে ব্যাগের মুখ খোলা রাখা হয় বা খবরের কাগজ অথবা পলিথিনের চাদর ট্রে থেকে স্পন্-রানের পর সরিয়ে রাখা হয়। কম্পোস্টের উপরিভাগে হাত দিয়ে চেপে দিতে হয়। পরে কেসিং মিশ্রণ ৩-৪ সেমি পুরু স্তরে সমানভাবে ব্যবহার করা হয়। কেসিং-এর স্তর কখনোই চাপতে নেই।

কেসিং এর পর যত্ন

কেসিং-এর পর এক সপ্তাহ ধরে মাশরুম ঘরের তাপমাত্রা প্রায় ২৫° সে. এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৫-৯০% রাখা জরুরি। এতে মাইসেলিয়াম কেসিং স্তরে ভালভাবে ছড়াতে পারবে। কেসিং স্তরটি লেপে দেওয়া হয়, যাতে কম্পোস্টের মধ্যে তাপশক্তি কিছুদিন সংরক্ষিত থাকতে পারে। এর দ্বারা অবশ্য প্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্পও সংরক্ষিত থাকে, যার ফলে মাশরুমের ফলন্ত শরীর বৃদ্ধির প্রাথমিক কাজে সাহায্য করে। উচ্চ আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য ২-৩ টি হাল্কা জলের স্প্রে (সূক্ষ্ম কুয়াশার মত) প্রতিদিন দেওয়া হয়। মাশরুম চাষের গোটা ঘরটিতে উচ্চ আর্দ্রতা রক্ষা এবং জল জমতে না দেওয়া খুবই জরুরি। এরপর উপযুক্ত বাতাস চলাচল ব্যবস্থাও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্পন্রান অবস্থা থেকে এই অবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বায়ুচলাচলের সুবন্দোবস্ত থাকলে চাষ ঘরে কার্বনডাই অক্সাইডের (CO_2) সর্বোত্তম অনুপাত বজায় থাকে। এসব ব্যবস্থা ঠিকমত চললে

বোতাম ছাতুর আকার (২.৫-৪ সেমি) ঠিকমত বাড়ে এবং ফসল তোলার উপযোগী হয়।

মাশরুমের ফসল তোলা এবং ফলন

ধীরে ধীরে আঙ্গুলের সাহায্যে ধরে ধরে তুলতে হয়। আস্তে করে আধারের বিপক্ষে চাপ দিয়ে এবং পরে বাঁকিয়ে মাশরুম তুলে নিতে হবে। বোঁটার নিচের অংশ যা কম্পোস্টের সঙ্গে লেগে থাকে, তা কেটে বাদ দেওয়া হয়।

এছাড়া একটি ধারালো ছুরি দিয়ে বোঁটার গোড়া কেটেও ফসল তোলা যায়। ফসল তোলার জন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। বোতাম ছাতু প্রায় দৈনিক তুলতে হয়। অন্যান্য ছাতুগুলি তাদের বৃদ্ধির সর্বোত্তম অবস্থায় তুলতে হয়। ধিংড়ি ছাতুর ফসল তোলার প্রকৃষ্ট সময় হ'ল, যখন ক্যাপ্ বা টুপিগুলি ভাঁজ হতে শুরু করবে এবং পোয়াল ছাতু পূর্ণ অবস্থায় বা তার সামান্য আগে তোলা হয়।

ফলন : বিভিন্ন বৃদ্ধির পরিবেশে কম্পোস্ট তৈরির পদ্ধতি, জাত, চাষ পদ্ধতি, যান্ত্রিক ব্যবস্থা ইত্যাদিতে মাশরুমের ফলনের তারতম্য ঘটে। সারা ভারতে মাশরুম চাষের যদিও একটা ভাল রকমের সাড়া জেগেছে, কিন্তু আধুনিক চাষ পদ্ধতির পরিকাঠামো তথা মূলধনের অভাবে ফলনের দিক দিয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় আমরা অনেকখানি পিছিয়ে রয়েছি। এখনো অনেক মাশরুম চাষী যদিও পাস্তরাইজ করা কম্পোস্ট ব্যবহার করছেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা প্রাকৃতিক অবস্থায় পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না করেই হচ্ছে। এতে স্বভাবতই মাশরুমের ফলনের তারতম্য ঘটছে। কিছু বড় চাষী সম্পূর্ণ যান্ত্রিক এবং কম্পুটারের সাহায্যে স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী মাশরুম চাষ করে খুব উচ্চফলন ও লাভজনক চাষবাসে কৃতকার্য হচ্ছেন।

যাই হোক, প্রাকৃতিক অবস্থায় বোতাম ছাতুর গড় ফলন ১০-১২ কেজি প্রতি ১০০ কেজি কম্পোস্টে। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ও অন্যান্য অবস্থায় অবশ্য এই ফলন অনেক বেশি হয়।

পোয়াল ছাতুর গড় ফলন প্রতি ৪ বর্গ মিটারে ৭-১০ কেজি। ধিংড়ি ছাতুর ফলন কিছুটা কম।

গ্রেডিং এবং সংরক্ষণ

মাশরুম খুবই স্পর্শকাতর নরম ফসল। তাই ফসল তোলার সময় যথোপযুক্ত যত্ন ও ক্ষয়ক্ষতি বা পচন থেকে তাদের রক্ষা করা একান্তই জরুরি। অনেক সময় ফসল তোলার পরই একটা খুব হাল্কা জলের স্প্রে করে পচন রোধ করা হয়।

বোতামের আকার, পিলিয়াসের আকৃতি, গিল্সের খোলা অবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে তাজা ফসল গ্রেডিং বা বাছাই করা হয়। তিনটি গ্রেডে মাশরুম বাছাই করা হয়। ১ নং গ্রেড—বোতাম, ২ নং গ্রেড—কাপ এবং ৩ নং গ্রেড—ছত্রাকের ছাতা বা খোলামুখ/ফলন্ত শরীর।

মাশরুম তোলার পরই তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। বেশিদিন রাখা যায় না। বেশিরভাগ

মাশরুমই তাই শহর এবং শহরতলিতে বিক্রয় হয় তাজা অবস্থায়। একটা অংশ শুধু সংরক্ষণ করা হয় রোদে বা বেশি তাপে শুকনো করে, কম তাপে জমাট বেঁধে, ক্যানিং করে এবং বোতলজাত অবস্থায় রাখা হয়।

● **শুকনো করা (Drying)** : ফসল তোলার পর ভালভাবে পরিষ্কার করে এবং ধুয়ে (হাল্কা জল স্প্রে করে) মাশরুমগুলি তারের ট্রেতে রেখে ৫০° সে. তাপমাত্রায় ঢুকিয়ে শুকনো করে সংরক্ষণ করা হয়। যদি ৫৫°-৬০° সে. তাপমাত্রায় কয়েক ঘন্টা পুনরায় বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে সংক্রামক জীবাণু ধ্বংস হয়। শুকনোর পর প্রায় ১২% জলীয় কণা মাশরুমে থাকে। এইভাবে শুকনো মাশরুম এক বছরের বেশি সংরক্ষণ করা যাবে। রোদে শুকিয়েও সংরক্ষণ করা যায়।

অনেক সময় শুকনো করার আগে এগুলি গরম জলে ২ মিনিট রাখা হয়। এতে মাশরুমের সংরক্ষিত জীবন (Storage life) আরো বৃদ্ধি পাবে। শুকনো মাশরুম পাউডার করেও দীর্ঘদিন সংস্থান করা যায়। শুকনো করা মাশরুম ও তাদের পদ্ধতি-প্রকরণ পরিষ্কার ছিপি-আঁটা জারে সংরক্ষণ করা হয় এবং তা ঠাণ্ডা ও শুকনো জায়গায় রাখা হয়। শুকনো সংরক্ষিত মাশরুমের স্বাদ এবং সুগন্ধ পরিবর্তিত হওয়ায় এগুলির চাহিদা সাধারণের মধ্যে বেশি থাকে না।

জমাট বাঁধা (Freezing) : পরিষ্কার করে ধোয়ার পর মাশরুমগুলি জল ঝরিয়ে পরে তা ডিপ্‌ফ্রিজে কম তাপমাত্রায় (-২৫° সে.) রেখে জমাট করা হয়। এতে ফসলের গুণাগুণ, স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ ভালো থাকে। কম তাপমাত্রায় রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজে সব ছাতুই অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায়।

● **ক্যানিং (Canning)** : সংরক্ষণে এটি একটি খুব ভাল পদ্ধতি এবং বাণিজ্যিকভাবে এই পদ্ধতিতেই মাশরুম সংরক্ষিত হয়। মাশরুম সংরক্ষণে ক্যানিং পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত ধাপে এই কাজ সম্পন্ন হয়—

(১) মধ্য আকৃতির বোতামগুলি (কাটা-কাটা বাদে) বাছাই করা হয়। কেবলমাত্র মসৃণ এবং ছোট বোঁটাযুক্ত মাশরুমই ক্যানিং-এর উপযুক্ত। তাই ফসল তোলার ঠিক পরেই তাদের রেফ্রিজারেটরে বা ফ্রিজে রাখা হয়।

(২) ভাল করে জলে ধুয়ে যথোপযুক্ত সাদা উজ্জ্বল রং ফেরানো হয়। সংরক্ষণের জন্য ০.১% সাইট্রিক অম্ল এবং ০.২৫% পটাশিয়াম মেটাবাইসালফাইড্ ধোয়া জলে মিশ্রণ করা দরকার।

(৩) এর পর ধোয়া মাশরুমগুলি ফুটন্ত জলে ২-৩ মিনিট ব্ল্যানচিং-এর জন্য রাখা হয়। পরে মাশরুমগুলি বের করে তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা জলে (০.৫-১% সাইট্রিক অম্ল এবং ১% সোডিয়াম ক্লোরাইড (লবণ)-এ রাখা হয়।

(৪) এবার এই ট্রিটেড মাশরুম উপযুক্ত আকারের টিনে / ক্যান জারে ৩/৪ অংশ রাখা হয় ভর্তি করে এবং এতে জলীয় দ্রবণে ভর্তি করা হয়। (২% সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং

০.১% সাইট্রিক অম্ল)। এরপর ক্যান্গুলির মুখে ঢাকা এঁটে দিয়ে ক্যানগুলি ফুটন্ত জলে (৮০°-৮৫° সে. তাপমাত্রায়) রাখা হয় ও মুখ সিল করে দেওয়া হয়।

(৫) সিল করা ক্যান / টিন অটোক্লেভ মেশিনে (০.৭% কেজি চাপে / বর্গ সেমি) ২৫-৩০ মিনিট রেখে তাপমাত্রা ১১৫° সে. এ উন্নীত করা হয়। এতে বাইরের সংক্রামক জীবাণু ধ্বংস হয়।

(৬) স্টেরিলাইজেশনের ঠিক পরেই সিল করা ক্যানগুলি ঠাণ্ডা জলে চুবিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। এতে মাশরুম স্পোরগুলির অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা প্রতিরোধ করে।

(৭) এবার ক্যানগুলি যথাযথ লেবেলিং করে গুদাম ঘরে ২ বছর বা তারও বেশি সংরক্ষণ করা যায়।

সপ্তম অধ্যায়

মাশরুম চাষের আর্থিক বিশ্লেষণ (Economics of Mushroom Cultivation)

একথা অনস্বীকার্য, মাশরুম চাষ আজ একটি খুবই উচ্চমানের প্রায়োগিক বিজ্ঞান। এর বিভিন্ন দক্ষ কাজকর্ম ও অন্যান্য বিষয় মাশরুম চাষের সাইজ অনুযায়ী কত টাকা বিনিয়োগ করা যাবে, তা নির্ভর করবে। ছোট চাষীদের বিকল্প অর্থকরী ব্যবসায়ে এক রকম বিনিয়োগ, আবার বড় চাষীদের বৃহদায়তন বাণিজ্যিক মাশরুম চাষবাসে আর এক রকম খরচ।

যাই হোক, মাশরুম চাষ শুরু করার আগে যে কোনো মাশরুম চাষীকে এইসব বিভিন্ন কাজকর্মে ও অন্যান্য প্রয়োগিক বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করতে হবে। যে কোনো নিয়োগ কর্তাকে উপযুক্ত বাজার সার্ভে করে তার উৎপন্ন ফসল কোথায় কিভাবে বিক্রি হবে, মাশরুমের কোনো্ জাতের বেশি চাহিদা, তা যাচাই করে তবেই ঝুঁকিপূর্ণ এই ব্যবসার কাজে নামতে হবে। সেইভাবেই মাশরুম চাষের পরিকল্পনার খসড়া করে আর্থিক লাভ-ক্ষতির দিকগুলো খতিয়ে দেখতে হবে। যে কোনো ফসল চাষের মত তাই মাশরুম চাষের আর্থিক বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই ব্যবসাতে **খরচ** (Expenditure) দু'ধরনের—(১) **স্থায়ী সম্পদ বা খরচ** (Fixed Assets) এবং (২) **পরিবর্তনশীল খরচ** (Variable costs) বা **চল্তি খরচ** (Recurring Expenditure)।

(১) স্থায়ী সম্পদ বা খরচ

এই খাতে কতকগুলি খরচ স্থায়ী প্রকৃতির, যেমন জমি, চাষঘর, বাতানুকূল যন্ত্রপাতি, বয়লার, ব্লেয়ার, সেলফ্ ইত্যাদি।

(২) চলতি খরচ বা পরিবর্তনশীল খরচ

এই খাতের খরচের মধ্যে মাশরুম ফসলের উৎপাদন খরচ, যেমন—কাঁচামাল : কম্পোস্ট দ্রব্যাদি, স্পন্ বা বীজ, কেসিং মাটি, বৈদ্যুতিক শক্তি খরচ, শস্য সংরক্ষণ দ্রব্যাদি (ছত্রাক নাশক তথা কীটনাশক ঔষধপত্র), শ্রম খরচ, কর্মীদের মাহিনা এবং অন্যান্য বিবিধ খরচপত্র, ইত্যাদি।

মাশরুম চাষ একটি শ্রম-নিবিড় কাজ, তা সে ছোট বা বড়, যেকোনো আকারেরই হোক না কেন। ছোট আকারের এককগুলি নিয়োগকর্তার বাড়ি বা পরিবারের লোকেরা নিজেরাই ম্যানেজ করতে পারেন। বাণিজ্যিকভাবে বড় এককগুলির জন্য বিভিন্ন কাজের/অবস্থার খরচের বহর ভিন্ন এবং বৃহত্তর। এতে অভিজ্ঞ বেশি মাহিনার লোকজন, বিভিন্ন কাজের জন্য (কম্পোস্ট তৈরি, স্পন্ বা বীজ প্রস্তুত, কেসিং বা আবরণ তৈরি, বেড স্প্রে করা ও অন্যান্য নানাবিধ কাজ) প্রয়োজন। এখানে সাধারণ কম মাহিনার শ্রমিক দক্ষ কাজে অচল। শুধু ফসল তোলার সময় একটু কম দক্ষ লোক হলে চলবে।

আবার মাশরুম চাষের অর্থনীতি মরসুমী চাষে এবং সারাবছরের চাষে ভিন্নতর হবে। এখানে আমরা তিন শ্রেণীর মাশরুম চাষে আর্থিক বিশ্লেষণ করে লাভ-ক্ষতির হিসাব পর্যালোচনা করব।

● পোয়াল ছাতু চাষে খরচ ও লাভ

সবথেকে একটি ছোট্ট ইউনিটের খরচ নিম্নরূপ। সারণী—৬ (ক)

		(টাকা)
● ধানের খড় (৫০ কেজি)	:	২৫.০০
● স্পন্ (১ প্যাকেট)	:	৫.০০
● পলিথিনের চাদর (স্থায়ী)	:	২০.০০
● খড় (পোয়াল ছাতুর জন্য খড় বসাবার ব্যবস্থা ১ বর্গ মিটার)	:	১০.০০
● ডালের গুঁড়া (২০০ গ্রাম)	:	৪.০০
● অন্যান্য খরচ	:	২.০০
	মোট খরচ	৬৬.০০

খড় বসাবার জন্য ব্যবস্থা এবং পলিথিন চাদরের দাম বাদ দিলে মোট খরচ পড়ে মাত্র ৩৬ টাকা। এই ছোট্ট বেড়ে যদি কমপক্ষে ৩ কেজি ছাতু পাওয়া যায়, তার দাম ১৪ টাকা হিসাবে ৪২ টাকা। যাঁরা গ্রীষ্মকালে পোয়াল ছাতুর চাষ করেন, তাঁদের খড় কেনার দরকার হবে না। এছাড়া কাঠের তক্তার জন্য কোনো খরচ করতে হবে না। গ্রামাঞ্চলে খড় এবং কাঠের তক্তা প্রতি বাড়িতেই রয়েছে বললেই চলে। তাহলে খরচ লাগবে কেবল স্পন্, ডালের গুঁড়া এবং আনুষঙ্গিক খরচ হিসাবে সর্বমোট ১১ টাকা। এছাড়া যিনি পোয়াল ছাতুর চাষ করবেন, তাঁর মজুরিও এখানে ধরা হয়নি। সুতরাং এই ছাতু চাষে একজন চাষী ঘরে বসে খুব সহজেই একটি ছোট আকারের কুটির শিল্প হিসাবে কাজ শুরু করতে পারেন।

একটু বড় আকারের করতে হলে, প্রাথমিক বিনিয়োগ হবে ৫,৫০০ টাকা (ক্যাপিট্যাল খরচ ২,৫০০, চল্‌তি খরচ ৩,০০০ টাকা) এবং নিট্ লাভ ২,৬৭৫ টাকা—৫টি গ্রীষ্মকালীন মাসে (মে-সেপ্টেম্বর) ৫টি ফসল ধরে এই হিসাব দেওয়া হ'ল।

সারণী ৬ (খ) : বিনিয়োগ ও লাভ : পোয়াল ছাতু চাষ

● উৎপাদন ঘরের আকার (লম্বা x চওড়া x উচ্চতা)	:	২০ ফুট x ১২ ফুট x১০ ফুট
● মোট ফসল নেওয়ার সংখ্যা	:	৫
● প্রতি ফসলে বেডের সংখ্যা (দ্বি-তল)	:	২০
(ক) ক্যাপিট্যাল খরচ (মূলধন)	:	(টাকা)
● বাঁশের কাঠি, ২¹/₂ লম্বা—২০টি		২০০.০০
● বাঁশের সেল্‌ফ পদ্ধতি, কাঠের পায়া ও তারের দড়ি (দ্বি-তল)	:	১২০০.০০
● একটি স্প্রে করার পাম্প	:	৬০০.০০
● একটি দাঁড়িপাল্লা ও ওজন	:	৫০০.০০
	মোট	২৫০০.০০ —(১)
(খ) চলতি খরচ (Working Costs)	:	(টাকা)
● ধানের খড় বা বিচালি, ৩০ কুইন্টাল	:	১৫০০.০০
● চটের সুতা, ১৫ কেজি	:	৪৫০.০০
● বীজ বা স্পন্, ১০০ বোতল	:	৯০০.০০
● পলিথিনের থলি, রাবার ব্যান্ড (মাশরুমের প্যাকিং-এর জন্য)	:	১৫০.০০
	মোট	৩০০০.০০ —(২)
(গ) মূলধনের উপর ক্ষতি খরচ, ২৫% (Depreciation on Capital Goods)		৬৫০.০০ —(৩)
(ঘ) লাভ (Returns)	:	(টাকা)
● মোট বিনিয়োগ (১+২)	:	৫৫০০.০০
● প্রত্যাশিত ফলন (কেজি), ২.২৫ কেজি —প্রতি বেডে হারে	:	২৫০ কেজি
● বিক্রি মূল্য (২৮ টাকা / কেজি)	:	৬৩০০.০০ —(৪)
● মোট উৎপাদন খরচ (২+৩)	:	৩৬২৫.০০ —(৫)
● নিট লাভ (৪-৩)	:	২৬৭৫.০০

● ধিংড়ি বা ঝিনুক ছাতু চাষের খরচ ও লাভ

এটি ধানের খড় বা বিচালি এবং অন্যান্য খামারের বর্জ্য পদার্থ থেকে তৈরি হয়। খড়ের চালাঘর, পলিথিনের চেম্বার এবং একটি মাটি/পাকা ঘরেও (চিত্র ১০ ও ১১) এই ছাতুর চাষ করা যায়। ১৫টি ব্যাগের (থলি) একটি লটে ধিংড়ি ছাতু চাষের (একটি ক্ষুদ্র চাষের একক) খরচ নিচে দেওয়া হ'ল।

সারণী—৭ : ধিংড়ি ছাতু চাষের আর্থিক হিসাব (টাকা)

১। (ক) খরচ		(টাকা)
● ১৫টি নাইলন নেটের খরচ		১৫.০০
● ৭.৫ মিটার পলিথিন চাদর		৩০.০০
● নাইলন সুতা—১৫ ফুট	:	৭.০০
● উপরের খরচ ১০ বার পুনর্ব্যবহার	:	৫.২৫
● ৫ প্যাকেট স্পন্	:	১৭.৫০
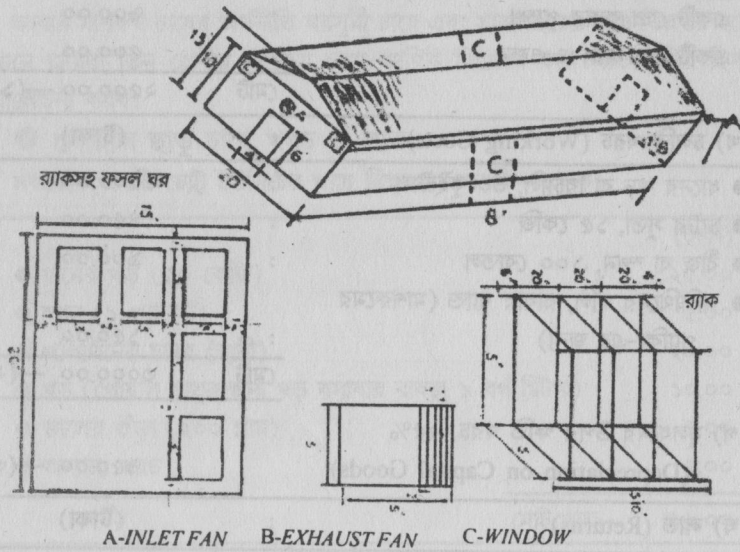
চিত্র : ১০. ধিংড়ি ছাতু চাষের জন্য মাটির ঘর/চালা ঘরের নকশা।
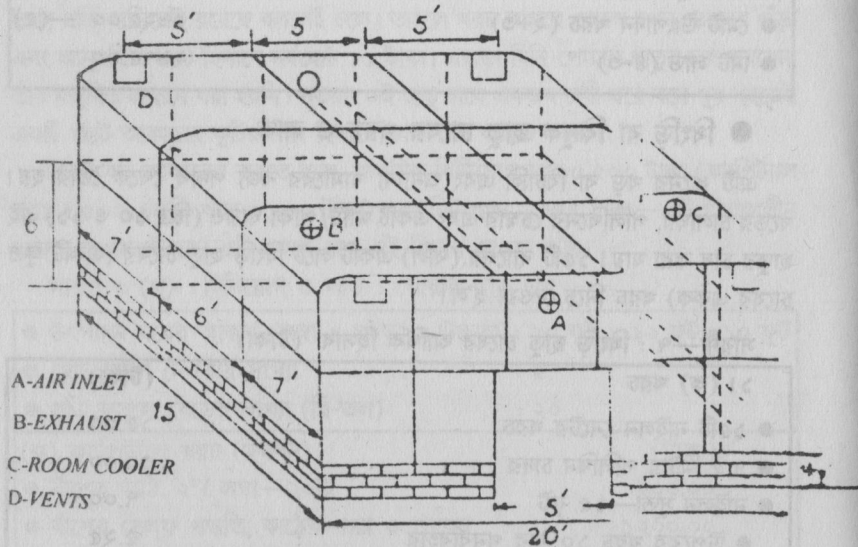
চিত্র : ১১. ধিংড়ি ছাতু চাষের ঘর (২০'x১৫'x১০')

● খড় ১৫ কেজি x ০.৪০	:	৬.০০
● শ্রম	:	৫.০০
মোট		৩৩.৭৫ —(১)
(খ) লাভ (Returns)		
● মাশরুম বিক্রয় ০.৪৫০ x ১৫ x টা. ১০.০০	:	৬৭.৫০ —(২)
● খরচের উপর আয় (২-১)	:	৩৩.৭৫
● লাভ ও ক্ষতি (১ বছরে ৩৩০ বার বিক্রয় (টাকা ৩৩.৭৫ x ৩০০)	:	১১,১৩৭.৫০

২। ছোট ফার্মে, অন্যভাবেও এই আর্থিক হিসাব নিম্নরূপ করা যায়—

(ক) খরচ		(টাকা)
● কাটা বিচালি বা ধানের খড় ১০০ কেজি x ০.৫০/কেজি	:	৫০.০০
● স্পন্ প্যাকেট ৪৫ x ১০ টাকা/প্যাকেট	:	৪৫০.০০
● পলিথিন ব্যাগ ১ কেজি x ৩২ টা./কেজি	:	৩২.০০
● বিবিধ খরচ—বিদ্যুৎ, স্প্রেয়ার, রোগ—পোকার ঔষধপত্র, ক্ষয় এবং সুদ ইত্যাদি	:	১০০.০০
মোট		৬৩২.০০
ধরা যাক,		৬৫০ টাকা — (১)
(খ) লাভ (Returns)		
● মোট ফলন (প্রত্যাশিত) ৮০কেজি x ২০ টা./কেজি	:	১৬০০.০০—(২)
● নিট আয় (২-১)	:	৯৫০.০০
● ১ কেজি ধিংড়ি ছাতু উৎপাদনের খরচ	:	৮.০০
● নিট লাভ : ১২ টাকা/কেজি মাশরুম।		

● বোতাম ছাতু চাষের খরচ ও লাভ

আগেই আলোচনা করা হয়েছে, বোতাম ছাতু বা সাদা মাশরুম চাষ খুব ব্যয় সাপেক্ষ। একটি ছোট আকারের ইউনিটে (২৫টি ট্রের জন্য) আনুমানিক খরচ নিম্নরূপ—

সারণী—৮ (ক)

		(টাকা)
● ধানের খড় (৩০০ কেজি)	:	১৫০.০০
● কাঠের গুঁড়া, সার, জিপসাম, ইত্যাদি	:	১৫০.০০
● স্পন্	:	১৫০.০০

● ট্রে বা কাঠের বারকোষ	:	৩০০.০০
● স্প্রে মেশিন (ছোট)	:	২০০.০০
● মজুরি (শ্রম)	:	২৫০.০০
	মোট	১২০০.০০

এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে, বোতাম ছাতু চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ঘরের ব্যবস্থা চাষীর থাকবে। তাই আলাদা খরচ ধরা হচ্ছে না। চাষের খরচ ৭৭৫ টাকা ধরা হলে, ফলন পাওয়া যাবে আনুমানিক ৫০ কেজি। বাজারে এর বিক্রয় মূল্য ২৫ টাকা কেজি ধরলে মোট দাম পাওয়া যাবে ১২৫০ টাকা। সুতরাং লাভ প্রায় ৪৭৫ টাকা। ছোট চাষীদের জন্য এই আয়-ব্যয়ের হিসাব এখানে দেওয়া হ'ল। বাণিজ্যিকভাবে পেশা হিসাবে এই মাশরুম চাষ করতে হলে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে তবে এগুতে হবে। কোথায় ভাল স্পন্ বা বীজ পাওয়া যাবে, প্রশিক্ষণ কোথায় দেওয়া হয়, বাজার সার্ভে এবং বিক্রয় কোথায় করা যাবে—এইসব বিস্তারিত জেনে তবে চাষের কাজে অগ্রণী হতে হবে। নতুন চাষীদের কিছু মাশরুম চাষের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা জরুরি।

বোতাম ছাতু চাষের খরচ ও লাভ

সাদা বোতাম ছাতু চাষে এর বিভিন্ন বৃদ্ধি দশায় এবং উন্নতিতে সঠিক পরিবেশ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবস্থার প্রয়োজন (নির্দিষ্ট নাতিশীতোষ্ণ তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বাতাস চলাচল প্রভৃতি)। সারাবছর চাষবাসের জন্য বিশেষ কৃত্রিম ব্যবস্থাযুক্ত চাষঘর, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কাজের জন্য এই সাদা বোতাম ছাতু চাষে তাই খুব উচ্চ বিনিয়োগ প্রয়োজন, যা সাধারণ ক্ষুদ্র চাষীদের পক্ষে অসম্ভব। তাই ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সাহায্য নিয়ে বোতাম ছাতুর চাষে অগ্রণী হতে হবে। যেসব জায়গায় বছরের যেকোনো সময় ৩০°-৩৫° সে. তাপমাত্রার বেশি হবে না, এমন নিশ্চিত জায়গায় বিশেষ প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান নিয়ে এই ছাতু চাষে বিনিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত। পাহাড়ী এলাকায় প্রাকৃতিক ঠাণ্ডা আবহাওয়ার জন্য খরচ অনেকটা কম হবে।

বড় আকারে বোতাম ছাতু চাষে প্রারম্ভিকভাবে যেসব চাষঘর প্রয়োজন, সে বিষয়ে একটা সম্যক চিত্র নিচে দেওয়া হ'ল—

● কম্পোস্ট তৈরি উঠান (৬০′ x ৪০′)	: বাইরে কম্পোস্ট তৈরির জন্য।
● বাল্ক চেম্বার (৩৬′ x ৯′ x ১২′)	: কম্পোস্ট তৈরি—দ্বিতীয় দশার জন্য। (Phase II)
● ইন্সুলেটেড চাষঘরগুলি (ঘর—৬টা, প্রতিটি ৩৬′ x ২৫′ x ১৩′)	: নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় শস্য চাষের জন্য।
● বাতাস-নিয়ন্ত্রিত ঘর (Air-Conditioned room, ১৫′ x ১৫′ x ১২′)	: Air-Condition যন্ত্রপাতি বসানোর জন্য।
● কেসিং সয়েল পাস্তুরাইজেশন ঘর (১২′ x ১২′ x ১০′)	: কেসিং মাটি পাস্তুরাইজ করার জন্য।

● ভাঁড়ার ঘর (Store Room) (১৫′ x ১৫′ x ১২′)	: টুল, যন্ত্রপাতি রাখার জন্য।
● অফিস ঘর (১২′ x ১২′ x ১২′)	: প্রশাসনিক কাজকর্ম করার জন্য।
● উপরে জলের ট্যাংক (Overhead Water Tank)	: জল সরবরাহ করার জন্য।

এখানে বোতাম ছাতুর চাষের ৪টি আর্থিক বিশ্লেষণ—**(১) দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতিতে প্রান্তিক মানদণ্ড** (Marginal scale by long method), **(২) মা-কম্পোস্ট ইউনিট থেকে প্রান্তিক স্কেলে পাস্তুরাইজড্ কম্পোস্ট ক্রয় করে, (৩) ক্ষুদ্র স্কেলের একক এবং (৪) বৃহৎ স্কেলে নিয়ন্ত্রিত মাশরুম চাষের প্রকল্প** (উৎপাদন বছরে ২৫০ টন) বিষয়ে আলোচনা করা হল।

সারণী—৮ (খ) : সাদা মাশরুম বা বোতাম ছাতু চাষের অর্থনীতি

(১) দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতিতে প্রান্তিক স্কেল		**(টাকা)**
(ক) স্থায়ী খরচ		
● একটি মাটির ফসল ঘর (৪০′ x ২০′ x ১৪′)	:	১৬,০০০.০০
● সেলফ্ তৈরির জন্য দ্রব্যাদি		৮,০০০.০০
● কম্পোস্ট তৈরির প্ল্যাটফর্ম (২৫′ x ২৫′) —ইটের তৈরি, মেঝে বালি-সিমেন্টের কাজ	:	৬,০০০.০০
● আঁকশি (forks), থার্মোমিটার, স্প্রে, পাম্প ইত্যাদির খরচ	:	২,০০০০.০০
	মোট	৩২,০০.০০
(খ) চলতি খরচ (একটা ফসল মরসুমে ২টি কাপ)		
● গমের খড় ১০০ টা./কুইন্টল—৮০ কুইন্টল	:	৮,০০০.০০
● ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (CAN) ৩৫০ টা. / কুইন্টল—২.৪ কুইন্টল	:	৮,৪০০.০০
● ইউরিয়া—৩৫০ টা. / কু.—০.৯৩ কুইন্টল	:	৩২৫.০০
● সুপার ফসফেট—৩৫০ টা. / কু-০.৮০ কুইন্টল	:	২৮০.০০
● মিউরেট্ অফ্ পটাশ—৩৫০ টা. / কু-০.৮০ কু.	:	২৮০.০০
● গমের গুঁড়া দানা—৪৫০ টা. / কু. —৮ কু.	:	৩,৬০০.০০
● জিপ্সাম—৫০ টা. / কু.—৪ কু.	:	২০০.০০
● স্পন্ বা বীজ—১২ টা. / বোতল—৭২০ বোতল	:	৮,৬৪০.০০
● কীট—রোগনাশক ঔষধ		৩০০.০০
● কেসিং সয়েল—২৫ টা. / কু.—৬০ কু.	:	১,৫০০.০০

- শ্রমিক খরচ—৩৫ টা./প্রতি শ্রম দিবস-৪৮০ শ্রম দিবস : ১৬,৮০০.০০
- বিবিধ খরচ : ১,০০০.০০

মোট ৪১,৭৬৫.০০

(গ) উপরি খরচ (Overhead cost) (টাকা)

- 'ক' এর উপর সুদ-১৫.৫% হারে এবং মূল্য হ্রাস (depreciation)-১০% হারে : ৮,১৬০.০০
- 'খ' এর উপর সুদ-১৫.৫% হারে—৮ মাসের জন্য : ৪,৩১৮.০০

মোট ১২,১৪৭৮.০০

(ঘ) মোট আয় (Gross Income) (টাকা)

- মাশরুমের ফলন—২৪ কু. ৩০ টা./কেজি হারে : ৭২,০০০.০০
- ২৪ কু. মাশরুম ৩০০০ টা./কু. হারে : ৭২,০০০.০০

(ঘ) নিট আয় (Net Income) [ঘ—(খ+গ)] : ১৭,৭৫৭.০০

(২) মা-কম্পোস্ট ইউনিট থেকে প্রান্তিক স্কেলে পাস্তুরাইজড় কম্পোস্ট ক্রয় করে বোতাম ছাতু চাষের অর্থনীতি

(ক) স্থায়ী খরচ (টাকা)

- চাষঘর নির্মাণ (২৫' x ১৮' x ১৪') : ২৫,০০০.০০
- বাঁশের র‍্যাক সমূহ : ৭,০০০.০০
- স্প্রে পাম্প, থার্মোমিটার ইত্যাদি : ২,০০০.০০
- ইটের মেজে তৈরি : ৬,০০০.০০

মোট ৪০,০০০.০০

(খ) চলতি খরচ (মরসুমে ২টা ফসল তোলা)

- কম্পোস্ট, স্পন্ এবং কেসিং সয়েল —১৪৫ টা / কু.—১০ টন : ১৪,৫০০.০০
- পলিথিন ব্যাগ—২ টা. হারে ৬,৭০০ ব্যাগ : ১,৩৪০.০০
- একটি শ্রমিক—৩৫ টা. শ্রম দিবস হারে ৯০ শ্রম দিবস : ৩,১৫০.০০
- কীটনাশক ঔষধ / ছত্রাকনাশক ঔষধ : ২০০.০০
- বিবিধ খরচপত্র : ১,০০০.০০

মোট ২০,১৯০.০০

(গ) উপরি ব্যয়

- মূল্য হ্রাস—১০% হারে এবং সুদ ১৫% হারে : ১৩,৩২৯.০০

(ঘ) মোট আয়

- মাশরুম ফলন—৩,০০০ টা. কু. হারে—১৫ কু. —১৫% হারে কম্পোস্ট ব্যবহৃত : ৪৫,০০০.০০

(ঙ) নিট আয় [ঘ—(খ+গ)] : ১১,৪৮১.০০

(৩) ক্ষুদ্র স্কেলের অর্থনীতি (টাকা)

(ক) স্থায়ী খরচ

- ২টি চাষঘর (৪০' x ২০' x ১২' প্রতিটি) : ১,২০,০০০.০০
- ১টি বাল্ক পাস্তুরাইজেশন চেম্বার তৈরির খরচ (মোটর, ব্লোয়ার ও ডাকটিং সহ) : ১,০০,০০০.০০
- কম্পোস্ট তৈরির প্ল্যাটফর্ম (৫০' x ২৫') : ১৫,০০০.০০
- ৪-টায়ার র‍্যাক—২টি ফসল ঘরের জন্য : ২৫,০০০.০০
- বয়লার ও পাইপ ফিটিং : ৭০,০০০.০০

মোট ৩,৩০,০০০.০০

(খ) চলতি খরচ (২টা ফসল)

- গমের খড়—১০০ টা. / কু.—২০০ কু. : ২০,০০০.০০
- পোলট্রি সার —২৫ টা. / কু.—১২০ কু. : ৩,০০০.০০
- ইউরিয়া—৩৫০ টা. / কু.—৩ কু. : ১,০৫০.০০
- গমের ভূষি (bran)—৪৫ টা. / কু.—২০ কু. : ৯,০০০.০০
- জিপ্‌সাম—৫০ টা. / কু.—১০ কু. : ৫০০.০০
- স্পন্—১২ টা. / বোতল—২০০ বোতল : ২০,০০০.০০
- পলিথিন ব্যাগ—২ টা. হারে—২০০০টি : ৪,০০০.০০
- কেসিং সয়েল—২৫ টা. / কু.—২৪০ কু. : ৬,০০০.০০
- রোগ-পোকার ঔষধ : ১,৫০০.০০
- জল ও বিদ্যুৎ : ২,০০০.০০
- শ্রম দিবস—৩৫ টা. হারে—১২০০ শ্রম দিবস : ৪২,০০০.০০
- বয়লারের জ্বালানি : ১,৫০০.০০
- বিবিধ খরচপত্র : ৫০০.০০

মোট ১,১৯,৫৫০.০০

(গ) উপরি ব্যয়

- সুদ—১৫.৫% এবং হ্রাস মূল্য ১০% হারে : ৯৬,৫০৩.০০

মোট ক্যাপিট্যালের উপর

(ঘ) মোট আয়

- মাশরুমের ফলন—৩,০০০ টা. কু.—৯০ কু. :২,৭০,০০০.০০
  —১৫% হারে কম্পোস্ট ব্যবহৃত : ৪৫,০০০.০০

(ঙ) নিট আয় [ঘ—(খ+গ)] : ৫৩,৯৪৭.০০

(৩) বৃহৎ স্কেলে নিয়ন্ত্রিত মাশরুম প্রকল্প
(বছরে ২৫০ টন উৎপাদন)

(ক) স্থায়ী খরচ

- জমির মূল্য (১ একর) : ৫,০০,০০০.০০
- রেজিস্ট্রি খরচ ও অন্যান্য : ৫০,০০০.০০

মোট : ৫,৫০,০০০.০০

(খ) ঘরবাড়ি নির্মাণ

- চাষঘর (৬০' x ২২' x ১২')—প্রতি বর্গফুট ১৫০ টা.—১৫,৮৪০ ব. ফুট—১২টি ঘর : ২৩,৭৬,০০০.০০
- করিডর (বারান্দা)—১৩' x ১৪' x ১২' ১৫০ টা / বর্গফুট হারে ১৫০০ ব. ফুট : ২,৭৭,০০০.০০
- প্যাকিং, Air Conditioned যন্ত্রপাতি ও অফিসঘর—১৫০ টা / ব. ফু—১৫০০ ব. ফু. : ২,২৫,০০০.০০
- কম্পোস্ট টানেল্ (সুড়ঙ্গ)—প্রতিটি ৪০' x ১০' x ৫২' —২০০ টা / ব. ফু. হারে ১ জোড়া—৮০০ ব. ফুট : ১,৬০,০০০.০০
- ব্লোয়ার এবং ডাকের মেঝে (২৫' x ১২' x ১৮') —২০০ টা / ব. ফু.—৩০০ ব. ফুট : ৬০,০০০.০০
- স্পন্ তৈরির চেম্বার (২৫' x ১২' x ১২' —২০০ টা/ব. ফু হারে ৩০০ ব. ফুট : ৬০,০০০.০০
- কম্পোস্ট তৈরির শেড (১০০' x ৫০' x ১৫')—৮০ টা/ ব. ফু. হারে ৫০০ ব. ফুট : ৪,০০,০০০.০০
- ভেজানোর আগে রাখার জায়গা (৫০' x ৫০')— ৩০ টা / ব. ফু.—২৫০ ব. ফুট : ৭৫,০০০.০০
- গমের খড় এবং পোলট্রি সারের স্টোর —৮০ টা / ব. ফু.—৪০০০ ব. ফুট. : ৩,২০,০০০.০০
- কন্ট্রোল রুম, বয়লার রুম, জেনারেটর ঘর ও গুড়ি পিট—১৫০ টা / ব. ফু.—২০০০ ব. ফুট : ৩,০০,০০০.০০
- স্পন্ল্যাব—২০০ টা / ব. ফু—১০৮০ ব. ফুট : ২,১৬,০০০.০০
- ক্যানিং এলাকা ও স্টোর—১৫০ টা. / ব. ফুট —২৬০০ ব. ফুট : ৩,৯০,০০০.০০
- অফিস ও পোর্টিকো—২০০ টা. / ব.ফু.—৯৬২ ব. ফুট : ১,৯২,০০০.০০
- বিবিধ নির্মাণ খরচ— : ৪,০০,০০০.০০
  - রাস্তা এবং বাউন্ডারি দেওয়াল : ৪,০০,০০০.০০
  - জলের ট্যাঙ্ক : ৭৫,০০০.০০
  - টিউবওয়েল ঘর—৮০ টা / ব. ফু—২০০ ব. ফু : ১৬,০০০.০০
  - গার্ডের ঘর—১৫০ টা. / ব. ফু—২০০ ব. ফু : ৩০,০০০.০০
  - ইন্সুলেশন ঘর—২৫ টা. / ব. ফু—৪১০০০ ব. ফুট :১০২৫০,০০০.০০

মোট : ৬৬,২২,৬০০.০০

(গ) বিভিন্ন মেশিন ও যন্ত্রপাতি

- বয়লার (Boiler)—৩৫০ কেজি স্টিম/ঘন্টা : ২,৫০,০০০.০০
- ব্লোয়ার (Blower)—৭.৫ হর্সপাওয়ার (HP) মোটরে স্থাপন—২ টা : ৪০,০০০.০০
- বাতাস পরিচালন ইউনিট—কম্প্রেসার চিলার, কন্ডেন্সার, ডাকটিং ইত্যাদি সহ : ২০,০০,০০০.০০
- জেনারেটর সেট ১০০ KVA ক্যাপ : ৪,০০,০০০.০০
- র‍্যাক সমূহ : ৭,২০,০০০.০০
- কম্পোস্ট টার্নার ও ফিলিং লাইন : ১৬,০০,০০০.০০
- বিদ্যুৎ ও বিদ্যুৎ সরঞ্জাম ফিটিংস্—কন্ট্রোল রুমে : ২,০০,০০০.০০
- কেসিং সয়েল ২৫ টা. / কু— ৪০০ M.T. : ১,০০,০০০.০০
- ক্যানিং খরচ—২৩০ MT মাশরুমের জন্য —ক্যানের খরচ (১ কেজি মাপের), ৯.৫০ টা / প্রতি ক্যান—২,৯৯,০০ টা : ২৮,৪০,৫০০.০০
  —ব্রাইন দ্রবণ, সাইট্রিক অ্যাসিড, স্টিকার ও অন্যান্য প্যাকিং দ্রব্যাদি—৩ টা / ক্যান : ৮,৯৭,০০০.০০
- মাহিনা ও বেতন / বছরে : ৪৫,০০০ টা / মাসে : ৫,৪০,০০০.০০/বছরে
- শক্তি মূল্য (Cost of energy)—বিদ্যুৎ ও ডিজেল, ৫০,০০০ / প্রতি মাসে : ৬,০০,০০০.০০

মোট : ৫৪,৩০,০০০.০০

(ঘ) উপরি ব্যয়

- সুদ ও হ্রাস মূল্য / বছরে—জমি : মোট খরচ ৫,৫০,০০০.০০, ১৫.৫% হারে সুদ : ৮৫,২৫০.০০

—ঘরবাড়ি : ৬৬,২২,৬০০.০০ টাকা, ৫% হারে হ্রাসমূল্য + ১৫% সুদ	: ১৩,৫৭,৬৩৩.০০
—যন্ত্রপাতি ও মেশিন : ৭৮,২১,০০০.০০ টা. ১০% হারে হ্রাসমূল্য	: ১৮,৯২,৩৫৫.০০
—প্রাথমিক ও প্রারম্ভিক খরচাপত্র, ২,২০,০০০.০০ টাকা—১৫% হারে সুদ	: ৩৪,১০০.০০
—কাঁচামাল, মজুরি ও বেতন / বছরে, ৫৪,৩০,০০০.০০—৪ মাস	: ২,৮০,৫৪০.০০
—কাঁচামাল, মজুরি ও বেতন—৪ মাসের জন্য : ১৩,৫৭,৫০০.০০ টাকা	: ১৩,৫৭,৫০০.০০
মোট	৫০,০৭,৩৭৮.০০
(ঙ) লাভ / বছরে (১০০% ক্যাপাসিটি ব্যবহার—১৮% কম্পোস্ট ওজনের ফলন)	
● মোট আয়—	
—ক্যান করা মাশরুম—৪০টা/ক্যান্	
—২,৯৯,০০০ ক্যান (২৩০ MT তাজা)	: ১,১৯,৬০,০০০.০০
—তাজা মাশরুম, ৩০,০০০ টা. / টন—২০ MT	: ৬,০০,০০০.০০
—পরিশোধ/বছরে	: ৩০,০০,০০০.০০
● নিট আয়/বছরে— (১,২৫,৬০,০০০.০০ - ৫০,০৭,৩৭৮.০০ + ৩০,০০,০০০.০০) = ৪৫,০০,০০০.০০ টাকা বা ৪৫ লক্ষ টাকা	

অষ্টম অধ্যায়

মাশরুমের পোকা-মাকড় ও রোগ—তাদের দমন পদ্ধতি (Insect-Pests and Diseases of Mushroom–their Control)

সারাবছর মাশরুম খুবই নিবিড়ভাবে চাষ করা হয়। এদের বৃদ্ধি দশায় সবসময় ভাল পরিবেশ পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। পরন্তু অনেক সময়ই তাপমাত্রা ২০° সে. এর বেশি হয়। এবং এর সঙ্গে অতিরিক্ত জল/জলীয় বাষ্প মাশরুমের বিছানায় বা আধারে দেখা দেয়। তার ফলে এই ফসল চাষে বিভিন্ন ধরনের পোকা, মাকড় (mites), নিমাটোড, অনেক ধরনের ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস-ঘটিত রোগ দেখা দেয়।

সাদা বোতাম ছাতু সহজেই সামান্য একটু পরিবেশ তারতম্য হলেই যে কোনো ক্ষতিকর রোগ-পোকার আক্রমণের শিকার হয়। বিভিন্ন বৃদ্ধি দশায় সামান্য একটু অযত্ন হলেই এই ছাতু চাষে মহামারী পর্যন্ত দেখা দিতে পারে। বিভিন্ন জৈবিক এজেন্ট (ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং পোকা-মাকড়) ছাড়াও বাতাস, জল, পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতি (কম্পোস্ট তৈরির সময়) বা কেসিং সয়েল, আধার, যন্ত্রপাতি এবং কাজের লোকেদের দ্বারাও এই বোতাম ছাতু চাষে বাইরের সংক্রামক রোগ-পোকার আক্রমণ সহজেই দেখা দিতে পারে। মাশরুমের বিভিন্ন প্রকার পোকা-মাকড়, রোগ এবং তাদের দমন পদ্ধতি বিষয়ে এই অধ্যায়ে বিশেষ আলোচনা হবে।

● পোকা-মাকড় এবং নিমাটোড

(ক) মাশরুম মাকড় (Mushroom Mites) : বিভিন্ন প্রকার মাকড়ের মধ্যে রাইজোগ্লিফাস্ (Rhizoglyphus), ফাইলোক্সেরিয়া (Phylloxerea), টাইরোফেগাস্ (Tyrophagus lintneri, *T. longion, T. putrescentiac*), হিস্টিয়োস্টোমা গ্রাসিলিপিস্ (*Histiostoma gracilipis*), ইত্যাদি মাশরুমের চাষঘরে দেখা যায়। এরাই ইনোকিউলামের বাহক।

টারসোনেমিড মাকড় (*Tarsonemus floricolus, T. mysceliophagers*) মাশরুমের মাইসেলিয়াম খেয়ে ফেলে। মাশরুমের ক্যাপে এবং বোঁটায় এরা ফুটো (holes) তৈরি করে চিবিয়ে খায়। এর ফলে স্পন্ রান ব্যাহত হয়। এরা মাইসেলিয়াল স্ট্র্যাণ্ড (মাশরুমের নিচের অংশে) ধ্বংস করে। এই মাকড় লাল-বাদামী রঙের স্টাইপ্ তৈরি করে। ফলে মাশরুমের বাজার মূল্য কমে যায়। এরা মাশরুমের বিভিন্ন ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

ট্রায়োগ্লিফিড্ মাকড় (Tryoglyphid mites) বেডের মধ্যে স্পন্-রান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। মাশরুম ফসল ফুটো করে খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। খড় বা বিচালি,

পোলট্রি সার, তুলাবীজ খাদ্য বা নিম্নমানের কম্পোস্ট প্রভৃতির মাধ্যমে এদের সংক্রমণ বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া অন্যান্য প্রজাতির মাকড়ও বেশ ক্ষতিকর।

অবায়বীয় অবস্থায় এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। প্রচুর জল স্প্রে করার মাধ্যমে এদের আক্রমণ বাড়ে। তাই মাশরুমে অতিরিক্ত জল দেওয়া কখনোই উচিত নয়। মাশরুম চাষঘরে স্টীম বা গন্ধকের ধোঁয়া দিলে এদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্যারাডিক্লোরো বেনজিন্ (PDB) দানা ব্যবহারেও এইসব মাকড় দমন করা যায়। ২ ভাগ বালিতে PDB সূক্ষ্ম দানা মিশিয়ে সমানভাবে আক্রান্ত বেডে ছড়ালে এইসব মাকড় দমন করা যায়। কাগজ বা অন্যান্য দ্রব্য ঢেকে মাশরুমের বেড সুরক্ষা করতে হয়।

(খ) মাশরুম মাছি (Mushroom Flies) : এদের সিয়ারিডস্ (Sciarids), ফোরিডস (Phorids), সেসিডস্ (Cecids) ইত্যাদি বলে। এইসব বিভিন্ন জাতের মাছি দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরির সময় দেখা যায়। যদি Phase-II দশায় কম্পোস্ট পাস্তরাইজ করার সময় তাপমাত্রা ঠিক না থাকে, এদের আক্রমণ বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে বোতাম ছাতু চাষে। কম্পোস্ট এবং কেসিং দ্রব্যে এদের লার্ভা ও পিউপা দেখা যায়। এই লার্ভা এবং মাছি মাশরুমের মাইসেলিয়াম ও বর্ধিত অংশ খেয়ে ফেলে। ফলে মাইসেলিয়াল্ বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। স্টাইপে এরা ফুটো করে সুড়ঙ্গ তৈরি করে। পিনহেড অবস্থায় এরা সাদা বোতাম ছাতু ও অন্যান্য ছাতুর রং বাদামী ও চামড়ার মত দেখায়। ফলন এতে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিভিন্ন প্রকার মাছি নিম্নরূপ—

(১) সিয়ারিডস মাছি দেখতে কালো রঙের, সরু শরীর এবং লম্বা অ্যান্টিনা থাকে। এরা মাশরুম বেডের সামান্য ক্ষতি করে। কিন্তু লার্ভা অবস্থায় এরা সাংঘাতিক মারাত্মক। বেডে এরা ডিম পাড়ে। লার্ভা কম্পোস্ট খেয়ে ফেলে, মাশরুমের বোঁটা ফুটো করে, ক্যাপ ধ্বংস করে। অনেক সময় ক্যাপেও এরা ডিম পাড়ে এবং এদের লার্ভা মাশরুমের উপর থেকে নিচের দিকে সুড়ঙ্গ তৈরি করে। লার্ভা কালো রঙের দেখতে হয়, ৬-৭ সেমি লম্বা হয়। কালো মাথা এবং লম্বা আকারই এদের চিনিয়ে দিতে সাহায্য করে।

(২) ফোরিডস মাছির (Phorids flies) ছোট্ট অ্যান্টিনা এবং পাখনা থাকে। গ্রীষ্মের প্রথমে ও শরতের শেষদিকে এদের লার্ভা খুব ক্ষতি করে। এদের সামনের অংশ খুব সরু। মাইসেলিয়ামের প্রভূত ক্ষতি করে—গর্ত করে সুড়ঙ্গ তৈরি করে এবং মাশরুম ফসলের সর্বনাশ করে। দিনের প্রথমভাগে এদের আক্রমণ খুব বেশি হয়।

(৩) স্প্রিং লেজ মাছি খুবই ছোট, খালি চোখে এদের দেখা যায় না। এদের মোটা অ্যান্টিনা থাকে। এরা খুব জোরে বুকে হেঁটে যেতে পারে। বাতাসে লাফিয়ে এরা কয়েক ইঞ্চি উপরে উড়ে যেতে পারে। বন্দুক পাউডারের মত মাশরুমের বেডে দেখা দিলে বুঝতে হবে এদের আক্রমণ হয়েছে। এরা মাইসেলিয়াম খেয়ে ফেলে। মাশরুমের বোঁটা ও ক্যাপ আক্রমণ করে ফসল ধ্বংস করে।

(৪) সেসিডস মাছি খুবই ছোট, কমলা ও কালো রঙের। খুবই কম দেখা যায়। এদের লার্ভা ফোরিডস এবং সিয়ারিডস থেকে খুবই ক্ষুদ্রাকৃতি হয়। দেখতে লালচে হলুদ, কমলা

বা সাদা, দুদিক সরু, ঘাড়ে কালো দাগ থাকে। এরা মাইসেলিয়াম খেয়ে ফেলে এবং বুকে হেঁটে হেঁটে বোঁটা ও গিলস্ খেয়ে ফেলে।

কালো বা ঘন বাদামী পূর্ণ মাছি সাধারণত ছোট্ট আকারের। ৪-৫ দিনে এদের ডিম থেকে লার্ভা বা ম্যাগট্ (maggot) তৈরি হয়। মাথা চক্‌চকে কালো। লার্ভাগুলি মাশরুম ফুটো করে খেয়ে ফেলে। পূর্ণমাছি খুব একটা ক্ষতি করে না। এরা ভার্টিসিলিয়াম বা ব্যাকটেরিয়া দাগঘটিত রোগের বাহক। এরা মাকড়ও বহন করে।

স্পন্ রানিং এর সময় চাষঘরে এদের প্রতিহত করতে হয়। এই সময় মাশরুমের চাষঘরে কম্পোস্টের সঙ্গে তাপমাত্রা ৮-১০ ঘন্টার জন্য ৭০° সে. রাখা বাঞ্ছনীয়। আক্রান্ত মাশরুম ধ্বংস করে ফেলা দরকার। ম্যালথিওন্ বা নুভান ০.১% স্প্রে করে কেসিং দ্রব্য ধুয়ে দিতে হবে। এছাড়া বি. এইচ. সি বা লিনডেন্ ০.৩-০.৪% কম্পোস্ট তৈরির সময় স্প্রে করা দরকার।

● মাশরুম নিমাটোড

সাধারণত তিন ধরনের মাশরুম নিমাটোড দেখা যায়—(১) *Saprophagus* (*Rhabditis* spp.), (২) *Predaceous* বা *Parasitic* বা পরগাছা বা *Myceliophagus* নিমাটোড় (*Aphelenchoides compositicola, A. aesterocaudatus*)।

স্যাপ্রোফেগাস্ নিমাটোড খবু বেশি ক্ষতিকর নয়, যদি তাদের সংখ্যা কম্পোস্টে খুব কম পরিমাণে থাকে। তবে এদের সংখ্যাধিক্য ঘটলে মাশরুমের ফলন কমে যেতে বাধ্য করে। কারণ এরা কম্পোস্টের মধ্যে বিষাক্ত বিপাকীয় পদার্থ উদ্গীরণ করে।

মাইসেলিওফেগাস্ নিমাটোড এবং প্যাথোজেনিক নিমাটোড সবথেকে বেশি ক্ষতিকর। এরা প্রত্যক্ষভাবে মাশরুমের মাইসেলিয়াম খেয়ে ফেলে। অনেক সময় কম্পোস্টের মধ্যে মাইসেলিয়াম প্রায় ভ্যানিশ্ হয়ে যায়। কম্পোস্ট খুব কালো রঙের হয়ে যায় এবং খুব কালো কালো দাগ দেখা যায়। কালক্রমে এই কালো দাগগুলি আস্তে আস্তে বড় হয় এবং সমগ্র স্পন্-রান অদৃশ্য হয়ে যায়। অতিরিক্ত আক্রমণে শস্যহানি ঘটে।

এদের দমনে আক্রমিত কম্পোস্টকে ৭০° সে. তাপমাত্রায় ৮-১০ ঘন্টা রাখতে হবে। পাস্তরাইজড্ কম্পোস্ট ব্যবহার অবশ্যই পালনীয়। যদি দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতিতে কম্পোস্ট প্রস্তুত করা হয়, তাহলে কার্বোফিউরান ০.৪% চতুর্থ বার উল্টানোর সময় (৪০০ গ্রাম / এক টন খড়ে) দেওয়া যুক্তিযুক্ত। ট্রেগুলি ২% ফরমালিন্ দিয়ে শোধন করা কর্তব্য। অবশ্যই তা ফসল হয়ে যাওয়ার পরে খালি অবস্থায় করতে হবে। এছাড়া লিনডেন গুঁড়ো ০.৬৫%, ৮০ গ্রাম/এক কুইন্টাল খড়ে কম্পোস্ট তৈরির সপ্তমবার উল্টানোর সময় ভাল করে মেশাতে হবে। স্পন্-ট্রেগুলি ৭ মিলি ম্যালাথিওন ৫০% ১০ লিটার জলে গুলে স্পন দেওয়ার ২ দিন পরে এবং কেসিং-এর ২ দিন আগে দিতে হবে। ৪০ মিলি নিমাগন (Nemagon) ১০ লিটার জলে গুলে স্প্রে করা দরকার, বিশেষ করে স্পন্-রানের সময়

এবং ফসল হওয়ার সময় ২২ মিলি নুভান ১০ লিটার জলে গুলে স্প্রে করা কর্তব্য। এছাড়া মাধ্যামক পরিচর্যাগুলি ঠিকমত করলে নিমাটোড দমন করা যাবে।

● মাশরুমের বিবিধ রোগ (Diseases of Mushroom)

(ক) ছত্রাক-ঘটিত রোগ (Fungal Diseases) : বিভিন্ন প্রকার মোল্ড (Moulds), যেমন—বাদামী বা ব্রাউন প্লাস্টার মোল্ড *(Populaspora byssina)*, সাদা প্লাস্টার মোল্ড *(Scopulariopsis fimicola)*, অলিভ গ্রীন মোল্ড *(Chaetomium olivaccum, C. globosum)*, হলুদ মোল্ড *(Mycellophthora lutea, Chrysosporium* sp.), লিপ্স্টিক মোল্ড *(Sporendonema purpurasceus)*, গ্রীন্ মোল্ড *(Trichoderma viride, K. koningii, K. lignorum* ইত্যাদি), ইংকি ক্যাপ্স *(Coprinus lagopus, C. comatus, C. atramentarius*, ইত্যাদি), ব্ল্যাক হুইস্কার মোল্ড *(Dortamyces stemonitis)*, সিনামন্ ব্রাউন মোল্ড *(Peziza ostracoderma)*, প্যারাসিটিক মোল্ড, যেমন—নরম মিল্ডিউ বা কবওয়েব (Cobweb–*Dactylium dendroides, Cladobotrycum dendroides)*, বাদামী দাগ রোগ (Dry bubble–*Verticillium fungicola, V. malthonsei, V. psallistac)*, ভেজা বাবল্ (Wet bubble–*Mycogone perniciosa)*, পিঙ্ক মোল্ড *(Trychothecium roseum)* প্রভৃতি প্রধান।

এইসব ছত্রাক-ঘটিত রোগের অনেকগুলিই প্রধানত কম্পোস্ট থেকে হয়, যেমন—অলিভ্গ্রীন মোল্ড, ইংকি ক্যাপ্স, গ্রীন মোল্ড, হলুদ মোল্ড প্রভৃতি। অন্যান্য মোল্ড, যেমন—মিউকর (Mucor), রাইজোপুস (Rhizopus) ইত্যাদিও কম্পোস্ট থেকে হয়। কম্পোস্ট এবং কেসিং সয়েল থেকে সাদা প্লাস্টার মোল্ড, বাদামী প্লাস্টার মোল্ড, লিপ্স্টিক মোল্ড, ফলস্ ট্রাফল্ (Falsetruffle) এবং গ্রীন মোল্ড, ইত্যাদি ছত্রাক রোগ দেখা দেয়। কেসিং সয়েল এবং / অথবা মাশরুম বৃদ্ধি দশায় সিনামন্ মোল্ড, শুষ্ক বাব্ল (Dry bubble), ভেজা বাব্ল (Wet bubble), বিবিধ গ্রীন মোল্ড, কবওয়েব মোল্ড, পিংক মোল্ড ইত্যাদি দেখা দেয়।

প্রতিযোগী মোল্ড (Competitor Moulds)

(১) বাদামী প্লাস্টার মোল্ড : কম্পোস্টের মধ্যে এই রোগে সাদাটে গোলাকার প্যাচ দেখা যায়। কেসিং সয়েলে পরবর্তী উল্টানোর সময় হাল্কা থেকে মরচে-পড়া বাদামী, গুঁড়া পাউডারের মত চিহ্ন দেখা যায়। স্পন্ দেওয়া ট্রে বা মাশরুম-ট্রেগুলিতেও এই লক্ষণ দেখা যায়। এই ছত্রাক রোগ খুব দ্রুত ছড়ায় এবং মাশরুমের ফলন দারুণভাবে কমে যায়।

বেশি ভেজা কম্পোস্টে, হাল্কা তাপমাত্রায় (২৮°-৩২° সে.) স্পন্ রানের সময় এবং ফলন হওয়ার সময় ১৮° সে. তাপমাত্রার বেশি হলে এই ছত্রাক বৃদ্ধির সুবিধা বাড়ে। এসব ক্ষেত্রে মাশরুম দেরিতে আসে বা অনেক সময় হয়ই না।

এর দমনের জন্য ঠিকমত কম্পোস্ট তৈরি, জল দেওয়া (৭০%), স্পন্ রান এবং ফসল হওয়ার সময় উপযুক্ত তাপমাত্রা সুরক্ষা করা, ব্যাগ, ট্রে এবং আক্রান্ত এলাকায় ২%

ফরম্যালিন দেওয়াতে তাড়াতাড়ি রোগাক্রান্ত চিহ্ন দেখলেই সব দ্রুত সরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি খুবই জরুরি।

(২) সাদা প্লাস্টার মোল্ড : প্রথমে ঘন সাদা স্তর বা প্যাচের মত মাইসেলিয়াম কম্পোস্ট এবং কেসিং সয়েলে দেখলেই এই রোগ হয়েছে বুঝতে হবে। সাদা আটার মত এই প্যাচগুলি দেখতে হয়। আস্তে আস্তে এই সাদা প্যাচ হাল্কা পিঙ্ক রঙের দেখতে হয়। এতে স্পন্ রান কম হয়, ফলে ফলনও কমে যায়। খুব বেশি জল কম্পোস্টে দিলে (কম্পোস্ট তৈরির সময়) বা অবায়বীয় সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় এই ক্ষতিকর ছত্রাকের বৃদ্ধি ভাল হয়। এছাড়া বাতাস থেকেও এই রোগ বাহিত হয়।

এদের দমনের জন্য সঠিকভাবে কম্পোস্ট তৈরি করতে হবে, পি. এইচ ৮ এর কম হতে হবে, ব্যাভিস্টিন্ ০.০৫% বা থাইরাম ০.১% ১০ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে।

(৩) অলিভ গ্রীন মোল্ড : কেসিং এর আগে এই ছত্রাক কম্পোস্ট বা স্পন্বেডে দেখা যায়। প্রথমে খুব ছোট সাদা বলের মত দেখায়। পরে অলিভ গ্রীন রঙের মত দেখায়। পুরানো কম্পোস্ট বা কেসিং সয়েল থেকেও এই রোগ সংক্রমিত হয়। ভালভাবে কম্পোস্ট পাস্তরাইজেসশন না হলে, বাতাস চলাচলে অসুবিধা থাকলে, অক্সিজেন কম হলে (কম্পোস্ট তৈরির সময়) এবং খুব বেশি ভেজা কম্পোস্ট হলে এই রোগের জীবাণু বৃদ্ধি হয়। অনেক সময় মাশরুম জন্মায় না।

দমনের জন্য যথাযথ কম্পোস্টের পাস্তরাইজেশন যথেষ্ট, বাতাস চলাচল ব্যবস্থা, অক্সিজেন সরবরাহ করতে হবে। তাপমাত্রা বাড়ানো চলবে না (৬০° সে.-র উপরে পাস্তরাইজেশন এবং কম্পোস্ট মিশ্রণের সময়)।

(৪) হলুদ মোল্ড : হাল্কা হলুদ প্যাচ্সহ সাদা তুলোর মত ধার সাধারণত বোতামের মাথায় দেখা যায়। কম্পোস্ট এবং কেসিং এর মধ্যবর্তী কালে হলদু-বাদামী স্ট্রমা দেখা দেয়। নাইট্রোজেন-পুষ্ট কম্পোস্টে সিপেডোনিয়াম (Sepedonium) প্রজাতির ছত্রাক দেখা যায়। এছাড়া যেখানে দীর্ঘস্থায়ী কম্পোস্ট তৈরি পদ্ধতি নেওয়া হয় এবং পোলট্রি সার ব্যবহার করা হয়, সেখানেও এই ছত্রাক রোগ দেখা দেয়।

দমনের সহজ পদ্ধতি হ'ল, যথাযথ কম্পোস্টের পাস্তরাইজেশন, ১.৫-১.৭৫% এ নাইট্রোজেন থাকা, পোলট্রি সার ব্যবহার না করা (দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতিতে) এবং ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইড ০.১৫% আক্রান্ত জায়গায় স্প্রে করা, ইত্যাদি।

(৫) লিপস্টিক মোল্ড : কম্পোস্ট বা কেসিং সয়েল সাদা মাইসোলিয়ালের তুলার মত বৃদ্ধি (প্রথম অবস্থায়) হয়। পরে তা পিঙ্ক রঙে পরিবর্তিত হয়—স্পোর তৈরির জন্য। বাতাস, কেসিং সয়েল বা শ্রমিকদের দ্বারাও এই ছত্রাকের সংক্রমণ হয়।

দমন : যথাযথ কম্পোস্টের এবং কেসিং সয়েলের পাস্তরাইজেশন করা, মাশরুম চাষঘরে সুস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, যথাযথ কম্পোস্টে জল (৬৮-৭২%) দেওয়া, খুব তাড়াতাড়ি তৈরি কম্পোস্ট ব্যবহার, ইত্যাদি অবশ্যই ভাল ব্যবস্থা।

(৬) ফল্স ট্রাফল্ (False truffle) : কম সাদা থেকে ক্রীম রঙের মাইসেলিয়াম

রোগে মাশরুম ক্যাপে ও স্টাইপে বাদামী, হাল্কা হলুদ দাগ বা কালিদাগ/আঁচিল/গর্ত ইত্যাদি দেখা দেয়। পরে এই দাগ পুরো বাদামী রঙের হয়। এই দাগগুলি অনিয়মিত, হলদেটে থেকে কালো বাদামী, ইত্যাদি হয়। বেশি আক্রমণ হলে গোটা মাশরুম ফসলই রশ্মির ধরনের আঁকাবাঁকা ডোরা বাদামী রঙের হয়ে অল্প বয়সে মারা যায়। খুব দ্রুত এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে। স্টোররুমে এতে মাশরুমের দারুণ ক্ষতি হয়। এই ব্যাক্টেরিয়ার জীবাণু মাটিতে থাকে। তবে জলেও থাকতে পারে, বিশেষ করে ফসল চাষে যখন ব্যবহৃত হয়। কেসিং সয়েলই এর প্রধান সূত্র। জলের দ্বারাও ছড়াতে পারে। এছাড়া মাছি, মাকড়, নিমাটোড ইত্যাদি এই রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। আর্দ্রতা বেশি হলে, বাতাস চলাচলের অসুবিধা হলে এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

দমনের জন্য বিভিন্ন মাশরুম মাছি, মাকড়, নিমাটোড আগে দমন করা দরকার। কেসিং সয়েল ভালভাবে শোধন ও নিষিক্ত করতে হবে এবং বাতাস চলাচল যথেষ্ট থাকা জরুরি। ক্লোরিনেটেড জল ব্যবহার করলে রোগ প্রশমন করা যাবে। পিন গঠনের আগে প্রতি ফুটে ৯ মিলিগ্রাম টেট্রামাইসিন বেডের উপর স্প্রে করতে হবে। বর্ধনশীল মাশরুমে জল স্প্রে করা উচিত নয়। রোগাক্রান্ত মাশরুম চাষঘর থেকে সত্বর নির্মূল করা দরকার এবং ব্লিচিং পাউডার ০.০৫% হারে ৭ দিন অন্তর স্প্রে করলে ভাল ফল দেবে।

● ভাইরাসজনিত রোগ

বিভিন্ন ধরনের জটিল ভাইরাসের দ্বারা (লা ফ্রান্স, ওয়াটারি স্টাইপ, X-diseases ইত্যাদি) যে সব নানাবিধ রোগ হয়, তাদের বাদামী রোগ (brown disease), x-disease, watering stipe, ড্যাইব্যাক রোগ (die-back) ইত্যাদি বলে। এই রোগে মাশরুম সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাইসেলিয়াল বিস্তার ভাল হয় না। কেসিং-এ আংশিকভাবে মাইসেলিয়াম ভেতরে ঢোকে। গুচ্ছাকারে মাশরুম দেখা যায়। প্রথম ফ্লাসেই দেরীতে পিনহেড দেখা দেয়। অনেক সময় কেসিং সয়েলের নিচেই পিনহেড অদৃশ্য হয়। ফলন্ত শরীরের ফ্যাকাশে সাদা রং প্রথমেই দেখা দেয়। লম্বা এবং বাঁকানো স্টাইপসহ মাশরুম দেখা দেয়। সাবস্ট্রেটে আলগাভাবে মাশরুম ধরা থাকে। অনেক সময় এই রোগ চেনা খুব মুশকিল হয়। অনেক ক্ষেত্রে আবার ভাইরাসজনিত রোগে কোনো চিহ্ন থাকে না। এ পর্যন্ত মাশরুমের এই রোগে ৬টা ভাইরাস পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। এদের বিস্তার ঘটে মাশরুম স্পোরের সাহায্যে এবং স্পন, ফোরিড্ মাছির লার্ভা, টারসিনোমিড মাকড় ইত্যাদিও ভাইরাসের বীজ বহনে সাহায্য করে।

দমন : মাশরুমের চাষঘর কম্পোস্টসহ ভাল করে লক্ষ্য রাখতে হবে, বিশেষ করে ফসল নেওয়ার পর ৭০° সে. তাপমাত্রায় ১২ ঘন্টার জন্য ফসলের শেষ পর্যায়ের সময়। ট্রেগুলি ২-৪% সোডিয়াম পেন্টাক্লোন ফ্যানেট ০.৫-১%, সোডিয়াম কার্বোনেট (Na_2CO_3) দ্রবণ একসঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। কঠোর পরিচ্ছন্নতা, পরিশোধন দরজা, মেজে, দেওয়াল ইত্যাদি ৪% ফরম্যালডিহাইড দ্রবণে ধোয়া খুব জরুরি। স্পন্ বা মাশরুমের বীজ উপযুক্ত শংসিত (certified) এবং নির্ভরযোগ্য জায়গা থেকে নেওয়া

দরকার। মাছি ও মাকড় যথাসময়ে ভালভাবে দমন করা চাই। কারণ, এরাই ভাইরাস জীবাণুর বাহক। কয়েকটি মাঠ মাশরুম ফসলের প্রজাতি, তথা *Laccaria laccata* মাশরুম ভাইরাস রোগের প্রাকৃতিক ডিপো বলে সন্দেহ করা হয়।

অজীবজনিত রোগ (Abiotic or Non-pathogenic diseases or disorders)

(১) রোজ কোম্ব (Rose comb) : ডিজেল, কেরোসিনের সংস্পর্শে (হাইড্রোকার্বন্স) এই রোগ হয়। অতিরিক্ত কীটনাশক/ছত্রাকনাশক ঔষধ ব্যবহারেও হতে পারে। এতে মাশরুমগুলি বিসদৃশ আকারের হয়। পিলিয়াস বিকৃতকার দেখতে হয়। ল্যামেলি পিলিয়াসের উপরিভাগে গঠিত হয়। অথবা চিরুনির মত দেখায়। এদের 'Morohelloidd' (মোরোহ্যালয়েড) বলে। এই রোগ মূলতঃ কয়লা, তেলপোড়ার গন্ধ বা ধোঁয়া থেকে হয়। এরকম বিকৃতিযুক্ত মাশরুম বিক্রয় করা মুশকিল হবে।

এর দমনের জন্য কেরোসিন, পেট্রল বা ডিজেল দিয়ে ভারী মেশিনপত্র, চাষঘর গরম করা চলবে না। কেসিং-এর সময় ঔষধপত্র ব্যবহার না করাই ভাল। প্রয়োজন-ভিত্তিক ঔষধ ব্যবহারই সবথেকে উপযুক্ত।

(২) পিনহেড মৃত্যু (Pinhead death) : একে 'ক্রিপ্টোমাম্মি রোগ' (Cryptomummy disease) বলে। মাশরুম বেডে বেশি জল দিলে এই রোগ দেখা দেয়। পিনহেডের বৃদ্ধি বন্ধ হয়, রং হলুদ-বাদামী হয়ে যায় এবং অকালে মারা যায়। দমনের জন্য বেডে অতিরিক্ত জল দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

(৩) স্ট্রমা (Stroma) : কেসিং সয়েলে সাদা মাইসেলিয়াল বৃদ্ধি একটা জমাট গঠন তৈরি করে। পিনহেড তৈরি বাধাপ্রাপ্ত হয়। অত্যধিক আপেক্ষিক আর্দ্রতা, CO_2-র উচ্চ মাত্রার উপস্থিতি এবং উচ্চ তাপমাত্রা এই রোগের জন্য দায়ী।

দমন পদ্ধতি : ট্রেগুলি পুনর্বার কেসিং, র‍্যাকগুলির এবড়ো-খেবড়ো বা অমসৃণ করা দরকার। বোতাম ছাতু চাষে বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ এবং অবস্থার বাতাবরণ তৈরি করতে হবে।

(৪) ফাঁপা কাণ্ড, ছাড়ানো স্টাইপ ও আঁশ হওয়া (Hallow stems, scaling, split stipes) : এই অজীবজনিত রোগটি প্রধানত কম আর্দ্রতা, অতিরিক্ত বাতাস বা খরা এবং ঠাণ্ডা হাওয়া ও কম জলীয় বাষ্প কেসিং এবং চাষঘরে থাকলে হয়। মাশরুমের কাণ্ড শক্ত না হয়ে ফাঁপা হয়। স্টাইপগুলি ফেটে যায় এবং আঁশ তৈরি করে। উপযুক্ত চাষপদ্ধতিও পরিবেশ সৃষ্টি করে এই রোগ দমন করা যাবে।

(৫) লম্বা স্টাইপ : বাতাস চলাচলের অব্যবস্থা, বেশি CO_2 চাষ ঘরে থাকা, ইত্যাদি এই লম্বা সরু স্টাইপ রোগের এবং ছোট ক্যাপ তৈরির জন্য দায়ী। সজনে ডাঁটার মত চেহারা দাঁড়ায়। দমনের জন্য যথাযথ বাতাস চলাচল এবং অন্যান্য সফল চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

(৬) আগাছা মাশরুম : মাশরুম কম্পোস্টে *Coprinus cinereus* প্রজাতি একটি বিশ্বজনীন আগাছা মাশরুম। এর বোতামগুলি লম্বা, আঁশযুক্ত, ছাতার মত খোলে এবং

ক্যাপ কালো ইন্‌কি গঠনে মিলিয়ে যায়। এদের "ইংক্ ক্যাপ্‌স" (Ink-caps) বলে। কম্পোস্ট ভালভাবে প্রস্তুত না হলে এই আগাছা মাশরুম দেখা দেয়। মাশরুম চাষে এটি কোনো বিশেষ ক্ষতিকর উপদ্রব হয় না। তবে কম্পোস্ট ঠিকমত তৈরি করে এর সহজ দমন করা যাবে।

সামগ্রিক সাবধানতা অবলম্বন ও ব্যবস্থাপত্র

(১) সর্বদা কম্পোস্ট তৈরি সিমেন্টের মেজেতে ২% ফরম্যালিন দিয়ে শোধন করে তবে করতে হবে।

(২) পরিষ্কার শোধিত ঘরে বীজ তৈরির কাজ করতে হবে। বোতলগুলিতে স্পন্ বা বীজ রাখার আগে ভাল করে শোধন করতে হবে, যাতে সংক্রমণ না হয়।

(৩) উৎপাদন ঘরে ২% ফরম্যালিন স্প্রে করে ২৪ ঘন্টা আগে শোধন করতে হবে। তারপরই ব্যাগ, ট্রে ইত্যাদি স্পন্ তৈরির জন্য আনতে হবে।

(৪) বাইরে জুতো খুলে চাষঘরে সর্বদা যেতে হবে। চপ্পল ইত্যাদি ২% ফরম্যালিন দ্রবণে ডুবিয়ে তারপর তা পায়ে গলিয়ে চাষঘরে যাওয়া যাবে।

(৫) ফসল তোলার সময় পরিশোধিত কাঁচি, ব্লেড বা অন্যান্য ছোট যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে।

(৬) রোগাক্রান্ত মাশরুম সঙ্গে সঙ্গে তুলে ফেলতে হবে এবং তা ফরম্যালিন দ্রবণে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

(৭) মাশরুমের বোতাম কখনোই ট্রে/থলিতে ফেলে রাখা যাবে না। ফসল তোলার পরই তা কাগজে জড়িয়ে নিতে হবে।

(৮) যে কোনো পোকা বা রোগের আক্রমণ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৯) চাষঘর সর্বদা ২% ফরম্যালিন দ্রবণ দিয়ে শোধন করতে হবে—প্রত্যেকবার ফসল তোলার পরই।

(১০) ফসল তোলার পর ট্রেগুলি একইভাবে শোধন করতে হবে।

(১১) ব্যবহার করা কম্পোস্ট চাষঘরের ধারে-কাছে রাখা চলবে না।

নবম অধ্যায়

প্রশিক্ষণ প্রসার ও আঁত্রেপনা বা ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ (Extension Training and Entrepreneurship)

ভারতবর্ষে মাশরুম চাষের সংগঠিত প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৯৮৯ সালে মাদ্রাজ (অধুনা তামিলনাড়ু অঞ্চলে। পোয়াল ছাতুর চাষ শুরু হয় ১৮৮৯ সাল থেকে তামিলনাড়ুতে।

অয়স্টার বা ধিংড়ি বা ঝিনুক ছাতুর চাষ শুরু হয় মহিশূরে ৬০ দশকে। এর প্রশিক্ষণ যদিও কয়েক হাজার চাষীকে দেওয়া হয়েছিল, সে তুলনায় ব্যাপক হারে এই ছাতু চাষের প্রসার লাভ তখন তেমনভাবে হয়নি।

আই সি এ আর ১৯৬১ সাল থেকে মাশরুম চাষের উপর একটি প্রকল্প শুরু করে হিমাচল প্রদেশের সোলানে। চাষবাসের প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে গবেষণার পর্যায়ে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করে এবং মাশরুম চাষ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food and Agriculture Organization বা FAO) তাদের মাশরুম চাষের বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিনিয়োগের বিশেষজ্ঞগণ ১৯৬৯ সাল থেকে ভারত সরকারকে, প্রদান করে। বিভিন্ন বিদেশী মাশরুম বিশেষজ্ঞরা বোতাম ছাতু চাষে ভারতে প্রশিক্ষণ প্রসার ও ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

একটি ভারত-হল্যান্ড মাশরুম উন্নয়ন প্রকল্প সোলানে ১৯৮২-৮৩ সালে শুরু হয়। ১৯৬১ সাল থেকে সমস্ত প্রচেষ্টা এই সেন্টারে শুরু করা হয়। দি ন্যাশন্যাল সেন্টার ফর মাশরুম রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (NCMRT) সোলানে শুরু হয় ১৯৮৩ সালে। একটি সর্ব-ভারতীয় সমন্বিত মাশরুম উন্নয়ন প্রকল্প (AIC MIP) ষাট দশকে সোলানের সঙ্গে যুক্ত হয়। হিমাচলপ্রদেশে মাশরুম চাষ মধ্য-ষাট দশকেই খুব জনপ্রিয় হয়ে বিস্তার লাভ শুরু করে। তবে মাশরুম চাষীরা রাজ্যে প্রকৃতপক্ষে নিবিড়ভাবে মাত্র ৮০ দশকে এই চাষ শুরু করে। মাশরুম চাষের আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল একটু দেরিতেই লোকেরা বুঝতে শুরু করেছে।

একটি FAO-UNDP প্রকল্পে ১৫৪ জন মাশরুম চাষী হিমাচলপ্রদেশে ১৯৮১ সালে মাশরুম চাষে উদ্যোগী হয়। ১৯৮৫-৮৬ সালে এই চাষীর সংখ্যা বিভিন্ন কারণে ১০ এ নেমে আসে। এই রাজ্যে অনেক সরকারী ও বে-সরকারী সংস্থা (NGOS) এবং এজেন্সিরা নতুন মাশরুম-চাষীদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং সম্প্রসারণ শুরু করে। জম্মু ও কাশ্মীরে বোতাম ছাতুর চাষ শুরু হয় ১৯৬৫ সালে। কয়েকশত গ্রামের লোক এই ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে ১৯৬৭ সালেই বিরাট উদ্যোগ নেয়। এ রাজ্যে ১৯৭৬ সালে মাশরুম চাষে একটা বিশাল উৎসাহজনক উদ্যোগ বৃদ্ধি পায়। তবে কিছু কারণের জন্য জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের চাষীরা আবার নিরুৎসাহ বোধ করেন এবং ১৯৮১-৮২ সালে এই সংখ্যা মাত্র ১২-তে নেমে আসে।

এইভাবে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে মাশরুম চাষের প্রচেষ্টা ও উন্নয়ন বৃদ্ধিলাভ করে। উত্তর প্রদেশের সমতল ও পাহাড়ী এলাকায় ৬০ দশকে এইভাবে উদ্যোগ শুরু হয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, মহীশূরে এবং অন্যান্য কিছু রাজ্যে অনুরূপ প্রচেষ্টা শুরু হয়। NCMRT মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ বিষয়ে একটা বিশেষ প্রচেষ্টা শুরু করে হরিয়ানার সোনেপত জেলায় ১৯৮৫ সালে। এইভাবে মাশরুম চাষের অধিক এবং ফলিত প্রযুক্তি খুব নিবিড়ভাবে ৫০ জন চাষীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য—এদের দ্বারাই আবার এই চাষ ছড়িয়ে পড়বে এবং অদূর ভবিষ্যতে প্রায় ৫০০ জন চাষী মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ প্রসার ক্ষুদ্র উদ্যোগী চাষীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে—বিশেষ করে বোতাম ছাতু চাষে। যদিও এই উন্নতির সূচক একই হারে বৃদ্ধি পায়নি। তবু মাশরুম চাষ নতুন উদ্যমে এবং উৎসাহে নতুন চাষীদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে।

দি ইন্দো-ডাচ্ মাশরুম প্রজেক্ট এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রকল্প জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশে নতুন আশা ও উদ্দীপনা জাগাতে সমর্থ হয়। যদিও ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বোতাম বা ধিংড়ি ছাতু চাষে তেমন উল্লেখযোগ্য অংশীদার হতে পারেনি, তবু এখানে পোয়াল ছাতু চাষে একটা ভাল বিস্তার, উৎসাহ এবং সম্ভাবনা রয়েছে।' বছরে ৩০০ টন পোয়াল ছাতু এখানে তৈরি হতে পারে। বোতাম ছাতু ১৯৮৮-৮৯ সালে প্রায় ১৬০০ টন উৎপন্ন হয়েছিল। ধিংড়ি ছাতুও প্রায় ওই বছর ১০০ টনের মত উৎপাদন হয়েছিল। পাঞ্জাবের পেপ্সিকো প্রকল্প বোতাম ছাতু চাষে একটা নতুন আশা ও উদ্দীপনা জাগিয়েছে।

এইভাবে গত ৩০ বছর ভারতীয় উদ্যোগী মাশরুম চাষীদের এক শতাংশেরও কম বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, NCMRT, সোলান প্রভৃতি জায়গায় যারা প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত হয়েছিল, তারাই প্রকৃতভাবে মাশরুম চাষে এবং ব্যবসায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে।

সমস্যা ও প্রতিকার

মাশরুম চাষীদের অনেক রকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, বিশেষ করে বাণিজ্যিকভাবে যখন মাশরুম করতে অগ্রণী হয়। এগুলি এভাবে সাজানো যেতে পারে—

● ফসল উৎপাদনের অনিশ্চিত গতি প্রকৃতি।

● শস্যহানি।

● বাজারের অভাব।

● মাশরুম চাষের যথাযথ প্রযুক্তি হাতের কাছে না পাওয়া, বিশেষ করে গ্রামীণ বিকল্প অর্থকরী ফসল হিসাবে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিকাঠামো না-থাকা।

● প্রথম ফসল তোলার খরচ বেশি পড়ে, কারণ ফসল উৎপাদন কম হয়।

● স্থানীয় সহজ সরল ভাষায় চাষীদের জন্য উপযোগী পুস্তিকার অভাব—বিভিন্ন রাজ্যে এই সমস্যা এখনো প্রকট।

● যেসব প্রযুক্তি পুস্তিকা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, NCMRT, সোলান, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া যায়, তা এতই বিশদ এবং জটিল যে সাধারণ চাষীদের চটজলদি শস্যউৎপাদনেপ্রশিক্ষণ নিতে খুব অসুবিধা হয়।

● তিনটি প্রধান শ্রেণীর মাশরুম চাষের (বোতাম ছাতু, ধিংড়ি ছাতু এবং পোয়াল ছাতু) ক্রমাগত প্রদর্শনী ক্ষেত্র প্রতিটি রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে চাষীদের মধ্যেই করে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। এতে সরেজমিনে মাশরুম চাষীদের প্রশিক্ষণ খুব কার্যকরী হবে। মাশরুম বিজ্ঞানী/বিশেষজ্ঞ/কর্মী তথা কৃষকদের সবারই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করে মাশরুম চাষকে বাণিজ্যিক গ্রামীণ কুটির শিল্প তথা বৃহদাকারের শিল্পে পরিণত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

● এই প্রশিক্ষণ প্রসার এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে মাশরুম চাষের যথাযথ পরিকাঠামো উন্নয়ন করে সঠিকভাবে সরকারী এবং বেসরকারী স্তরে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন গ্রামীণ ক্লাব, মহিলামণ্ডল, চর্চামন্ডল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা খুবই প্রয়োজন। ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে চাষীদের সহজ কিস্তিতে কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা দরকার। NCMRT, সোলান থেকে বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে রাজ্যে রাজ্যে গ্রামান্তরে মাশরুম চাষের ব্যাপক বিস্তার ঘটাতে হবে।

● মাশরুমের যথাযথ বাজারজাত করা, চাষীদের ন্যায্য দাম পাওয়া, রপ্তানি ব্যবসায় সাহায্য করা, উপযুক্ত সংরক্ষণ প্রযুক্তিতে সাহায্য করা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া, প্রভৃতি বিষয়ে উন্নয়নশীল পরিকাঠামোর প্রয়োজন।

● যেহেতু তাজা মাশরুম, বিশেষ করে বোতাম ছাতু এবং অন্যান্য ছাতু তোলার পরই খুবই স্বল্পস্থায়ী, বেশিদিন রাখা যায় না, পচে যায়—তাই ভাল আকার ও মান বজায় রেখে দূরে বাজারজাত করা বা সংরক্ষণ করা খুবই কঠিন। তাই সংরক্ষণ প্রযুক্তি কাঠামো উন্নতির গবেষণা দরকার।

● মাশরুমভোজীদেরও অনেক সমস্যা রয়েছে। অনেকে বেশ কিছু মাশরুম খেতে এখনো ভয় পায়। তাই যথাযথ মাশরুম চেনার বিষয়ে প্রশিক্ষণ/প্রদর্শনক্ষেত্র ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভোজ্য ও বিষাক্ত মাশরুম প্রজাতি সম্বন্ধে ব্যাপক ধ্যান-ধারণা জন্মাতে হবে।

● মাশরুমের বিভিন্ন ধরনের আকর্ষক খাবার (recepes) গ্রামে, শহরে, নগরে, বিভিন্ন মেলায়, আলোচনাচক্রে করে দেখানো ও খাওয়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে মাশরুমের খাদ্যগুণ এবং উপাদেয় বিষয়ে লোকের আগ্রহ বাড়বে।

● জাতির উন্নতিতে মাশরুম চাষে সরকারী পদক্ষেপ বেশি করে প্রসার করা দরকার। গ্রামের বেকার যুবক-যুবতীদের আর্থিক সাশ্রয়ে মাশরুমের চাষ, খাদ্য গুণাগুণ ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বিষয়ে এখনো ব্যাপক কর্মসূচীর খুবই অভাব রয়েছে।

● হর্টিকালচার (উদ্যানবিদ্যা) তথা এগ্রোনমি বিভাগে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় মাশরুম চাষের ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া দরকার—বিশেষ করে কৃষি বিভাগ, পঞ্চায়েত ইত্যাদির মাধ্যমে।

● বোতাম ছাতু চাষে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রযুক্তিবিদ্যা আহরণ, ব্যাপক যান্ত্রিক ও চাষের পূর্ব প্রস্তুতি, আর্থিক ব্যবস্থা ও পরিকল্পনার দরকার। সরকারী আনুকূল্যে গ্রামীণ কৃষক সম্প্রদায়, কৃষক রমণী এবং যুব সম্প্রদায়কে সহজেই উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপক সম্প্রসারণসূচী নেওয়া কর্তব্য। একে সহজেই গ্রামীণ কুটির শিল্পে পরিণত করা যায়।

● অনেক সরকারী বিভাগই মাশরুম চাষে বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করে থাকে, যেমন কেন্দ্রীয় শুল্ক আবগারি বিভাগ (Central Excise), বিদ্যুৎ দপ্তর, আয়কর বিভাগ ইত্যাদি।

● মাশরুম চাষের উন্নতি এবং ব্যাপক প্রসারে কেন্দ্রীয় শুল্ক/আবগারি দপ্তর বাতানুকূল যন্ত্র, হিমঘর, অফিস, ল্যাবরেটরি ইত্যাদিতে বিশেষ ছাড় দিতে পারেন। বোতাম ছাতুর ক্ষেত্রে এসব বিশেষ অত্যাবশ্যক। কেন্দ্রীয় কৃষি ও বাণিজ্য দপ্তর বিভিন্ন কৃষি ফসলের সঙ্গে মাশরুম চাষে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, রপ্তানি, বিদেশী মুদ্রা ছাড় ইত্যাদি দিলে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারত অনেক বিদেশী মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবে। এতে মাশরুম চাষে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের আগ্রহ বাড়বে।

● পরিশেষে মাশরুম চাষে বিজ্ঞানীদের আরো কম খরচের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। যেহেতু অন্যান্য মাঠ ফসল চাষের থেকে এতে বহুগুণ লাভ হয়, ব্যাপকহারে পরিকাঠামো বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ব্যবস্থা করা দরকার।

বাণিজ্যিক চাষবাস এবং রপ্তানি (Commercial Cultivation and Export)

আমাদের দেশে কম খরচে লাভজনকভাবে মাশরুমের চাষ করা খুবই সম্ভব। কারণ, আমাদের কম খরচে শ্রমিক পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা, প্রচুর পরিমাণে খড় ও অন্যান্য কৃষি বর্জ্য পদার্থ, স্পন্ এবং অন্যান্য উপাদান এখানে বাণিজ্যিকভাবে মাশরুম চাষবাসে অঢেল রয়েছে।

এপিডা (APEDA বা the Agricultural and Processed Food Products Exports Development Authority) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি খুব কার্যকরী বিভাগ। ১৯৮৮ সাল থেকে বিভিন্ন কৃষিজ ফসল রপ্তানিতে এই বিভাগ বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। ভারতবর্ষে তাই মাশরুম ফসলচাষে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নতি এবং রপ্তানি করতে হলে সরকারকে প্রথমেই অনুধাবন করতে হবে, কিভাবে একে বাণিজ্যিক তথা শিল্পে পরিণত করে গ্রাম- গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এর জন্য তাই সরকারীস্তরে বিশেষ বিভাগ গঠন করতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ, একটি ১০ কোটি টাকার প্রকল্প ভালভাবে হাতে নিয়ে তার উপযুক্ত প্রযুক্তি উন্নয়ন, সারাবছর প্রদর্শন তথা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে চাষবাস শেখানো, কৃষকদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, সমবায় কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে শস্য ক্রয় ও ন্যায্য দাম প্রদান, প্রভৃতি বিষয়ে জোর দিতে হবে। এতে গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব হবে।

এভাবে ১০ কোটি টাকার প্রকল্পকে পঞ্চম বছরে একটি উপযুক্ত ১২০ কোটি টাকার উন্নত প্রকল্পে দাঁড় করানো খুবই সম্ভব। দশম বছরে তা বেড়ে ৭০০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে

বলে অর্থনীতিবিদরা হিসেব করে দেখিয়েছেন। এভাবে গ্রামীণ শিল্প গড়ে উঠলে দেশ এবং জাতি দ্রুত উন্নতিলাভ করবে। বিদেশে ভারতের মাশরুম রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষকরা সারা বছরই কাজ পাবে। অন্যান্য মাঠ ফসল চাষের সঙ্গে সঙ্গে মাশরুম চাষ অনায়াসেই একটি বিকল্প অর্থকরী পুষ্টিজোগানকারী চাষ এবং শিল্পে পরিণত হতে পারবে।

১৯৮৯ সালে সারা বিশ্বে ৩.৫ মিলিয়ন টন মাশরুম চাষে প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ১২,০০০ কোটি টাকা) আয় হয়। একে ১৫ বিলিয়ন ডলারে পরবর্তী ৫ বছরে উন্নীত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। যদি এই ধারা ক্রমাগত অব্যাহত থাকে, তবে এই লক্ষ্যে না পৌঁছাবার কোনো কারণ নেই। (১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি)।

এইভাবে আগামী ২০ বছর ধরে যদি প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে, ভারত আন্তর্জাতিক স্তরে শতকরা ১০ ভাগেরও বেশি উৎপাদন রপ্তানি করতে সমর্থ হবে। আমাদের দেশের জলবায়ুতে সব ধরনের জাতের মাশরুমই ভালভাবে চাষ করা সম্ভব। শুধু দরকার উপযুক্ত পরিকাঠামো, পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ এবং বাণিজ্যিক চাষবাসের কলাকৌশল/প্রযুক্তি ও রপ্তানির সুযোগ-সুবিধা।

তথ্যাবলী : ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মাশরুম চাষের অগ্রগতি ৯ নং সারণীতে দেওয়া হল। এছাড়া বিশ্বে মাশরুমের ব্যবহার (সারণী-১০), সারাবিশ্বে মাশরুমের শিল্পবৃদ্ধি (সারণী-১১), চীন দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মাশরুম চাষ (সারণী-১২), ইত্যাদি তথ্যাবলী দেওয়া হ'ল।

সারণী-৯ : ভারতে রাজ্যভিত্তিক মাশরুম চাষ (টন)

রাজ্য	১৯৯২-৯৩	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৯-২০০০	ছাতুর চাষ
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩০০	৫০০	২,৫০০	বোতাম/ঝিনুক
বিহার	৫	১০	৫০	ঝিনুক
দিল্লি	৫০০	৬০০	১,০০০	বোতাম/ঝিনুক
গুজরাট	১০	১৫	৫০	ঝিনুক
হরিয়ানা	১৬৫০	৩০০০	৪,০০০	বোতাম
হিমাচলপ্রদেশ	২০০০	৩৫০০	৫০০	বোতাম
জম্মু ও কাশ্মীর	৩০০	৫০০	৪০০	বোতাম
কর্নাটক	৫০০	৬০০	৬০০	বোতাম/ঝিনুক
কেরালা	৩০০	৪০০	১০০	ঝিনুক/পোয়াল
মধ্যপ্রদেশ	২০০	১২০০	২,০০০	বোতাম/ঝিনুক
মহারাষ্ট্র	২৫০	৫০০	৭,০০০	বোতাম/ঝিনুক
ওড়িশা	৫০	৬০০	৭০০	বোতাম
পাঞ্জাব	১২০০	৪২০০	৪,০০০	বোতাম
রাজস্থান	৫	১০	৫০	ঝিনুক

তামিলনাড়ু	১২০০	৪৫০০	১০,০০	ঝিনুক/পোয়াল
উত্তরপ্রদেশ	২৫০০	৩৫০০	৪,০০০	বোতাম/ঝিনুক
পশ্চিমবাংলা	৫০	১২০০	২৫০	বোতাম/ঝিনুক
অন্যান্য রাজ্য	৫০০	১০০০	২,৮০০	তিন শ্রেণীর
মোট	১১,৫২০	২৫,১২৫	৪০,০০০	তিন শ্রেণীর

সারণী-১০ : বিশ্বে মাশরুমের ব্যবহার (গ্রাম/জনপ্রতি/বছরে)

দেশ/বছর	১৯৬০	১৯৬৫	১৯৭০	১৯৭২	১৯৭৪	১৯৮০	% বৃদ্ধি
পশ্চিমজার্মানী	১৫০	৫৩০	১১৩০	১৭০০	২০২০	২৪৫০	১২৪
সুইজারল্যান্ড	৩৩০	৪৬০	৯৬০	১১৪০	১৩৪০	২২৫০	৭৮
ফ্রান্স	৭০০	৮৫০	১০২০	১৪২০	১৪৪০	২১০০	৬০
কানাডা	২৫০	৫৭০	৭৫২	১০০০	১৪০০	২০০০	৮৪
বেলজিয়াম	৪৪০	৭৩০	৮৮০	৯৬০	১৫৬০	২০০০	৬৮
ডেনমার্ক	৩৯০	৭৮০	৯৬০	১০৭০	১৩৫০	১৮০০	৬২
সুইডেন	২২০	৪১০	৫৫০	৮১০	১০০০	১৪৬০	৫৩
ইউ. কে	৩০০	৪৭০	৭৪০	৮৮০	৯৮০	১৩৮০	৫০
হল্যাণ্ড	১১০	৫০০	৫৬০	৮৬০	৯৩০	১৩৫০	৫৭
ইউ. এস.	২৯০	৩৩০	৫১০	৬৮০	৭৩০	১২০০	৫৪
স্পেন	২০	৮০	১২০	১৮০	৪০০	১১৪০	৩০
ইটালি	৪০	১৪০	১৭০	৫৯০	৭০০	১০৬০	৪৮
অস্ট্রেলিয়া	১৪০	২০০	৪০০	৪৮০	৬৬০	১০০০	৫০

(Source : News letter Report of the International Society for Mushroom Science, 1992)

সারণী-১১ : মাশরুম চাষের শিল্প বৃদ্ধি—সারা বিশ্বে (টন)

বছর	ইউ.এস	ফ্রান্স	ইউ.কে.	পশ্চিম জার্মানী	হল্যান্ড	ইতালি	এশিয়ার দেশ
বোতাম ছাতু							
১৯৫০	৩০,০০০	১০,০০০	১১,০০০	৬০০	৩০০	১,৫০০	—
১৯৬০	৫০,০০০	৩০,০০০	১৫,০০০	৫,৪০০	৩,০০০	৩,০০০	১,০০০
১৯৬৫	৭৫.০০০	৪৯,০০০	৩০,০০০	৯,০০০	১৩,০০০	৭,০০০	৩০,০০০
১৯৭০	৮৫,০০০	৬৮,০০০	৫৫,০০০	২০,০০০	২৯,০০০	১০,০০০	৪৮,০০০
১৯৭৫	১,২৭,০০০	১,১৪,০০০	৫৫,০০০	২৯,০০০	৪০,০০০	৩৮,০০০	১,২৫,০০০
১৯৮০	২,১৩,০০০	১,৩১,৭০০	৬১,০০০	৩৫,০০০	৬০,০০০	৬১,০০০	১,৬৫,০০০
১৯৮৬	২,৮৫,০০০	১,৬৫,০০০	৯৫,০০০	৩৮,০০০	১,১৫,০০০	৭৫,০০০	২,৪০,০০০
১৯৯০	৩,০২,০০০	২,০০,০০০	১,১৮,০০০	৪৩,০০০	১,৪০,০০০	১,০০,০০০	২,৩০,০০০

অন্যান্য ছাতু							
১৯৭০	—	—	—	—	—	—	তথ্য পাওয়া যায়নি
১৯৭৬	—	৬০০	—	—	—	১,৩০০	১০,০০০
১৯৮১	৫,০০০	৫,০০০	৫,০০০	৫,০০০	৫,০০০	৫,০০০	২,১০,০০০
১৯৮৬	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	৯,৪৫,০০০
১৯৯০	১,১২,০০০	১,১২,০০০	১,১২,০০০	১,১২,০০০	১,১২,০০০	১,১২,০০০	২২,২৭,০০০

সারণী-১২ : চীন দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মাশরুম চাষ (টন)

মাশরুম শ্রেণী	১৯৭০	১৯৭৫	১৯৮১	১৯৮৫	১৯৯০
বোতাম ছাতু	—	৩০,০০০	৫০,০০০	১,৮৫,০০০	১,৭০,০০০
সিটেক (Shiitake)	জানা নেই	জানা নেই	জানা নেই	১,২০,০০০	২,১০,০০০
চাইনিজ	জানা নেই	জানা নেই	২৬,০০০	১,০০,০০০	১,১০,০০০
ধিংড়ি	—	—	—	১,০০,০০০	৮,০০,০০০
কাঠকান (Wood Ear)	জানা নেই	জানা নেই	জানা নেই	৮০,০০০	৩,৬০,০০০
রুপালি কান (Silver Ear)	জানা নেই	জানা নেই	জানা নেই	৫০,০০০	১,০০,০০০
বানর মাথা (Monkey Head)	জানা নেই	জানা নেই	জানা নেই	৫০,০০০	৯০,০০০
শীতকালীন	—	—	—	১০,০০০	৪০,০০০
নামেকো (Nameco)	—	—	—	৮০০	৩২,০০০
বসা-মুরগি (Sitting Hen)	—	—	—	—	২০০
অন্যান্য	—	—	—	—	৩,৫৪০
মোট	—	৩০,০০০	৭৬,০০০	৬,৯৫,৮০০	১৯,১৫,৭৪০

মাশরুম চাষের বিভিন্ন প্রতিনিধি

খাদ্য তালিকায় উচ্চগুণমান সম্পন্ন পুষ্টিমূল্যের জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগুলিকে মাশরুম চাষের উন্নতির জন্য নিযুক্ত করা হয়। এপিডা (APEDA) এবং জাতীয় উদ্যানবিদ্যা বোর্ড (National Horticultural Board বা NHB) এখন মাশরুম চাষে দারুণ আগ্রহ ও উৎসাহ দিচ্ছে। গ্রামীণ ভারতে মাশরুম চাষের বিকল্প নেই। গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান বৃদ্ধিতে তাই মাশরুমের চাষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামের দুর্বলতর শ্রেণীর লোকেদের জন্য আজ মাশরুম চাষই আর্থিক স্বচ্ছলতার একটি অন্যতম উপায়। গ্রামের মেয়েরা বাড়ির কাজকর্ম করে, বাচ্চা মানুষ ও পরিবার প্রতিপালন করে অবসর সময়ে সহজেই বাড়িতে

তাদের আর্থিক রুজি-রোজগারে মাশরুম চাষ করে বাড়তি সাহায্য করতে সক্ষম। এতে তাদের পরিবারের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে।

APEDAর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯৮-৯৯ সালে ভারত থেকে বিদেশে মাশরুম বা ছাতু রপ্তানি (Export) এরূপ—

(১) তাজা মাশরুম (Fresh mushrooms)
মোট রপ্তানি ১৫৫৯.৬ টন, বাজার মূল্য ৬.৪ কোটি টাকা।

(২) শুষ্ক মাশরুম (Dried mushrooms)
মোট রপ্তানি ৯২.৪২ টন, বাজার মূল্য ১৮,৯৫১ কোটি টাকা।

(৩) প্রক্রিয়াকরণ মাশরুম (Processed mushrooms)
মোট রপ্তানি ৬৮৮৩.৪৯৯ টন, বাজার মূল্য ২৫.৯৩৩ কোটি টাকা।

সারা বিশ্বে মাশরুম রপ্তানির প্রধান দেশগুলি (Major exporting countries) হ'ল—চীন (সারা বিশ্বের ৫০ শতাংশ), হল্যান্ড, তাইওয়ান এবং কোরিয়া।

এছাড়া রয়েছে আমেরিকা, ফ্রান্স, কানাডা, জাপান, ইউনাইটেড কিংডাম।

সারা বিশ্বে এখন ক্যান্‌করা ছাতু বা মাশরুমের মোট উৎপাদন প্রায় ৮ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে ১.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন হয় চীনদেশে।

পূর্ব ভারতে (Eastern India) আজকাল ধিংড়ি বা ঝিনুক ছাতুর চাষ বেশি হচ্ছে বটে, তবে এদের ব্যবসায়িক সাফল্য খুবই কম, চাহিদা এবং স্বাদে বহির্বাণিজ্যে এর দাম পাওয়া যাচ্ছে না। পোয়াল ছাতুর বাণিজ্যিক দিকও কম, রপ্তানীতে তেমন স্কোপ নেই বিদেশে। বোতাম ছাতুর চাহিদা সব থেকে বেশি। কিন্তু যেহেতু শীতকালে ভাল হয়, সাধারণ লোক এই ছাতুর ব্যয়সাধ্য চাষ তাঁরা বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতীত করতে পারেন না।

এখন গবেষণার ফলে বোতাম ছাতুর (*Agaricus spp.*) বেশ কয়েকটি নতুন জাত গ্রীষ্মকালীন জায়গাতেও খোলা জায়গায় চাষ করা সম্ভব হবে। ফলে বোতাম ছাতুর চাষে সাধারণ চাষীরা আরো আগ্রহ দেখাতে পারবেন। এইসব বোতাম ছাতুর খোলা জায়গায় চাষে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এদের খাদ্যমূল্য (food value) একই থাকছে এবং গুণমানও (quality) খুব ভাল। এর ফলে পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে এখন সাধারণ চাষীদের এই বিশেষ বোতাম ছাতুর জাতগুলি একটা নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রক (The Ministry of Food Processing Industries) এখন একটি ১১ কোটি টাকার প্রকল্প (প্ল্যানিং কমিশন কর্তৃক রচিত) পরিকাঠামো হাতে নিয়েছেন এই মাশরুম প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য। বেশ কিছু রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই প্রায় ১.৫ কোটি টাকার বেশি সাহায্য দিয়েছে। ১৯৯১ সালের শুরু থেকে এই প্রকল্প চালু হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, এবং বিহার। NHB-কে দিয়ে এই আর্থিক অনুদান রাজ্য কৃষি দপ্তর, রাজ্য হর্টিকালচার ডাইরেক্টরেট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এই প্রকল্পের কাজ-কর্ম হচ্ছে।

প্ল্যানিং কমিশন এ অবধি এপিডার সব প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে এবং মাশরুম চাষের উন্নয়নে পরিকাঠামোর উন্নয়ন তথা রপ্তানি বৃদ্ধির পরিকল্পনা নিয়েছে। মাশরুম রপ্তানির উন্নয়নে তথা দেশের খাদ্য এবং পুষ্টিমূল্য বৃদ্ধিতে ৫.৫ কোটি টাকার একটি বিশেষ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এপিডা এই প্রকল্পে প্রায় আরো ১৫ কোটি টাকার এক বিশেষ পরিকল্পনা নিতে যাচ্ছে—মাশরুম চাষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উন্নতি, তার খাদ্যমূল্য এবং বিকল্প পুষ্টিমানের জন্য।

কৃষিবিজ্ঞানীরা ১৯৯১ সাল থেকে মাশরুম চাষ প্রযুক্তিতে খুব বেশি উৎসাহ নিচ্ছেন। এপিডা বিভিন্ন প্রাইভেট সংস্থাগুলিকে এব্যাপারে উৎসাহ এবং আর্থিক বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। বাজারজাত করার কাজে বিশেষ সাহায্য এবং মাশরুম চাষ প্রযুক্তি উন্নয়নে অনেক কিছু করার কথা ভাবছে এপিডা।

NCMRT, সোলানের কিছু উর্ধ্বতন বিজ্ঞানী এবং ডক্টর পারমার ইউনিভারসিটি অফ্ হর্টিকালচার অ্যান্ড ফরেস্ট্রি (DPUHF), সোলান একসঙ্গে মাশরুম চাষের ব্যাপারে বিবিধ ভবিষ্যৎ গবেষণার পরিকল্পনা নিয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ষাট দশক থেকে ১৯৮৪ এবং NCMRT-তে ১৯৮৪ সাল থেকে সারা ভারতের গ্রামেগঞ্জে মাশরুম চাষের প্রধান গবেষণার কাজ চলছে।

টাটা চায়ের মাশরুম প্রকল্প বিগত ৩ বছর থেকে এ পর্যন্ত চালু আছে। ফ্লে'র দেরাদুনে ৮ কোটি টাকার মাশরুম প্রকল্প (ডাচ্ সহায়তায়) সম্প্রতি শুরু হয়েছে (১৯৯২ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে)। জুয়াড়ী অ্যাগ্রো NCMRTর সহায়তায় এবং নিবিড় তত্ত্বাবধানে ১৯৮৮-৮৯ সালে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিল। অসাফল্যের জন্য এখন তা বন্ধ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক শিল্পে তাই উচ্চমূল্য শস্য হিসাবে মাশরুম চাষ আজ প্রথম সারিতে। তাজা, শুকনো এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প হিসেবে এর সম্ভাবনা প্রচুর। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ মাশরুম চাষের প্রযুক্তি এবং পরিকাঠামো ভালভাবে কাজে লাগিয়ে দেশের খাদ্য সমস্যা এবং অপুষ্টিতার বিরুদ্ধে ভালভাবে লড়তে সক্ষম।

কম খরচে অর্থ উপার্জনকারী ব্যবসা

৫০টির বেশি বন্য মাশরুম জাত ভারতে চাষযোগ্য এবং ভোজ্য। এদের মধ্যে মাত্র তিন শ্রেণীর মাশরুম (বোতাম ছাতু, ধিংড়ি বা ঝিনুক ছাতু এবং পোয়ালছাতু) এখন বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয়। সারা বিশ্বের মাশরুম উৎপাদন ৩.৭ মিলিয়ন টনের মধ্যে ভারতের উৎপাদন মাত্র ৪০,০০০ টন/বছরে। এর মধ্যে পোয়াল ছাতুর অংশ একটি ভগ্নাংশ মাত্র। বোতাম ছাতু (Agaricus spp.) মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগের বেশি এবং আমাদের দেশে তা মূলত রপ্তানির জন্যই চাষ হয়। কিছুটা দেশের স্টার হোটেলে ব্যবহৃত হয়। বোতাম ছাতুর বাণিজ্যিক চাষবাসের জন্য বিশেষ প্রযুক্তি, নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উপযুক্ত আবহাওয়া তৈরি করে চাষবাস এবং উচ্চ আর্থিক বিনিয়োগ শুরু থেকেই দরকার হয়। সাধারণ চাষীদের পক্ষে ছোট আকারে তাই বোতাম ছাতুর ব্যবসা-ভিত্তিক চাষের জন্য পাস্তুরাইজ করা কম্পোস্ট, স্পন্ বা বীজ, জৈব পদার্থ, কম-খরচের

প্রযুক্তি, ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করা সমস্যাবহুল। এছাড়া এখনো গ্রামাঞ্চলে বোতাম ছাতুর রপ্তানিজনক মাশরুম চাষের কোনো পরিকাঠামোই নেই বললে চলে। তবে যে সব গ্রামাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ রয়েছে, সেখানে ক্ষুদ্র বা বৃহদাকারে বোতাম ছাতুর চাষের কোনো সমস্যা হতে পারে না।

অধিকাংশ ভারতীয় চাষী, বিশেষ করে মধ্য এবং দাক্ষিণ ভারতের মাশরুম চাষীরা এখন ধিংড়ি বা ঝিনুক ছাতুর (Oyster) চাষে বেশি উৎসাহী। মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গে এই ধিংড়ি ছাতু চাষের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন তামিলনাড়ুতে দৈনিক ঝিনুক/ধিংড়ি ছাতুর উৎপাদনই প্রায় ২ টন।

ধিংড়ি ছাতু (Oyster বা Pleurotus spp.)

এটি খুবই পুষ্টিকর, উচ্চ গুণসম্পন্ন, সুপাচ্য, স্বাস্থ্যকর এবং খুব সহজেই ভারতের যেকোনো পরিবেশে যে কোনো জায়গায় এর চাষ করা যাবে; গ্রাম, আধা-শহর, শহরতলি, শহর, নগর তথা পাহাড়ী এলাকাতেও। এই ছাতুর চাষে সব ধরনের দরকারী উপকরণই সর্বত্র সহজেই পাওয়া যাবে। স্বল্প প্রযুক্তি/কলাকৌশল, প্রচেষ্টার দ্বারা ধিংড়ি ছাতুর চাষকে লাভজনক করা যাবে এবং ক্ষুদ্র তথা বৃহদাকারেও এর চাষ সম্ভব। আমাদের দেশের অশেষ বেকারত্বের সমস্যা সমাধানে ধিংড়ি ছাতুর চাষের ছোট ছোট প্রকল্প গ্রহণ করে খুব সহজেই স্বল্প আয়াসে উন্নতি করা সম্ভব। স্বল্পজ্ঞান এবং দক্ষতা থাকলেই এই শ্রেণীর ছাতু চাষ বাণিজ্যিক ভাবে করা যাবে। চাষের আগে একটু প্রশিক্ষণ নেওয়া শুধু প্রয়োজন।

প্লুরোটাস কথাটা এসেছে গ্রীক শব্দ "প্লুরো" (Pleuro) বা একধারে/পাশে তৈরি হওয়া থেকে। সাধারণত ধিংড়ি ছাতু প্রাকৃতিক পরিবেশে, পচা কাঠের উপর বা প্রাথমিক পচনশীল বস্তুর উপর জন্মায়।

এ অবধি ধিংড়ি ছাতুর ৩৯টি জাতের সন্ধান পাওয়া গেছে। তারমধ্যে ভারতীয় পরিবেশে ১৫টি জাতের ভালভাবে চাষ করা যায়। কয়েকটি জাত আবার বর্ণশংকর। এদের বিভিন্ন আকৃতি, প্রকৃতি, রঙ দেখা যায়। বিভিন্ন জলবায়ু, পরিবেশ এবং চাষবাসের অবস্থানে এই বৈচিত্র্যতা দেখা যায়।

আগেই বলা হয়েছে, সমস্ত জাতের ধিংড়ি ছাতুকেই শীতকালীন ছাতু এবং গ্রীষ্মকালীন ছাতু দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। শীতকলীন ১৫° সে. তাপমাতার নীচেই এদের ফলন্ত শরীরের বৃদ্ধি ভাল হয়। গ্রীষ্মকালিন ২০° সে. তাপমাত্রার উপরে বৃদ্ধি ভাল হয়। এদের উৎপাদন সময় তাই অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত। পোয়াল ছাতু হয় মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

ভারতে যেসব চাষযোগ্য ধিংড়ি ছাতুর চাষ হয়, তাদের মধ্যে Pleurotus sajor-caju, P. cornucopiae, P. platypus, P. opuntiae, P. eous, P. corticatus P. cystidiosus, P. citrinopileatus এবং Pink pleurotus, ইত্যাদি প্রধান। তাই অন্যান্য ভোজ্য ছাতুর মধ্যে এই শ্রেণীর ছাতুর অনেক জাত বিশ্বব্যাপী চাষ করা যায়। এই জাতের

ছাতুগুলি খুব সহজেই যে কোনো তাপমাত্রার পরিবেশে বৃদ্ধি পায়। সব ধরনের বর্জ্য পদার্থে সঠিকভাবে এর চাষ করা যায়।

আমাদের দেশে কোষময় ছিদ্র বহুল বর্জ্য পদার্থের (cellulosic waste) পরিমাণ বছরে প্রায় ২৮ মিলিয়ন টনের বেশি। এই বিশাল বর্জ্য পদার্থ স্বভাবতই পরিবেশ দূষণে প্রভূত সাহায্য করে। এতে স্বাস্থ্যহানি ঘটে, প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হয়, এত বিশাল বর্জ্য পদার্থ ব্যবহারে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। এই বর্জ্য পদার্থকে আধুনিক পদ্ধতিতে শক্তির বিকল্প উৎস হিসাবে ব্যবহারের গবেষণা প্রচেষ্টা চলছে। এই বিশাল পরিমাণের কিছু অংশে তাই ধিংড়ি ছাতুর চাষ করে অতি সহজেই অর্থ উপার্জন এবং একইসঙ্গে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রাকৃতিক উপায়ে জৈব সার সংরক্ষণ তথা মাশরুম চাষে প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্য তৈরিতে তাই আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে আজ কাজে লাগানো দরকার। এতে দেশের অপুষ্টি-জনিত সমস্যা দূর হবে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে ভারসাম্য বজায় থাকবে।

কম-খরচের প্রযুক্তিতে আমাদের দেশে গ্রাম তথা শহরের সর্বত্র এই ছাতুর চাষে ব্যাপক উদ্যোগ প্রয়োজন। সরকারী এবং বেসরকারী প্রচেষ্টায় তা সহজেই সম্ভব। শুধু চাষের আগে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, বাজারজাত করা ইত্যাদি বিষয়ে জোর দিতে হবে।

এই ছাতু চাষে স্পন্-রানের সময়ে পরিবেশের অবস্থা এরূপ হতে হবে—তাপমাত্রা ২০°-৩০° সে., আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭৫-৮০%, আলোর দরকার নেই, অন্ধকারই কাম্য এবং বাতাস চলাচল ব্যবস্থা নিম্নতম হলেও চলবে।

ধিংড়ি ছাতুর প্রাথমিক বৃদ্ধি ও ফলন্ত শরীর গঠনের সময় তাপমাত্রা ২০°-৩০° সে., আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০-৮৫%, আলো—দিনে ২-৩ ঘন্টা (একটা টিউব লাইট/বাল্ব হলেও চলবে), আড়াআড়ি বাতাস চলাচল ব্যবস্থা দিনে ২-৩ ঘন্টা (ঘরের জানালা/দরজা খোলা থাকলেই চলবে) থাকা দরকার।

মাটির ঘর, চালাঘরে এই ছাতুর চাষ করা যাবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে মাশরুমের চাষঘর বিভিন্ন ডিজাইনের করা যেতে পারে (সমতল ও পাহাড়ী এলাকায় ভিন্নতর হবে)। তবে খরচ বহুল কোন বিশেষ চাষঘরের প্রয়োজন নেই। বাঁশের বাখারি দিয়ে ছিটা বেড়া দিয়েও এর চাষঘর নির্মাণ করা যাবে। এতে বাতাস চলাচলের জন্য জানালা/দরজা রাখা দরকার। কিছু আলো যাতে ঘরে ঢোকে, তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। দেওয়ালগুলি প্ল্যাস্টিক বা ফোমের চাদর দিয়ে ঢাকা দিলেও চলবে। এতে চাষঘরে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০-৮৫% এ বৃদ্ধি করা সহজ হবে। চাষ ঘরের ছাদ খুবই সহজ-সরল হবে। ছাদ থেকে জলের পাইপ লাগানোর ব্যবস্থা থাকা ভাল। ঘরের মধ্যে জেট্ লাগিয়ে রাখলে জল স্প্রে করে ঘরের বাতাস ঠাণ্ডা রাখা যাবে।

পোয়াল ছাতু (Volvariella spp.)

গ্রাম-ভারতের সর্বত্রই ছোট/বড় মাপের এই ছাতু সহজেই চাষ করা সম্ভব। ওড়িশ্যা, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গে এই ছাতুর চাষ প্রথম থেকেই চালু রয়েছে। অন্যান্য রাজ্যেও এর প্রচলন খুব সহজেই করা যাবে।

বিগত কয়েক বছরে মাশরুম চাষে অনেক পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ করে জাত (strains), কম্পোস্ট তৈরি, চাষ পদ্ধতি, যান্ত্রিক ব্যবহার, অটোমেশন (automation), প্রকরণ পদ্ধতি (Processing), প্যাকিং এবং প্যাকেজিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। এইসব সামগ্রিক পরিবর্তনে মাশরুমের গড়পড়তা ফলন ১৯৬৫ সালে ২.৩ কেজি/বর্গমিটার থেকে ১৯৯১-৯২ সালে বেড়ে হয়েছে ১৮.২০ কেজি/বর্গ মিটার।

আজকাল ছোট আকারে স্থানীয় বাজারের চাহিদা মেটাতে মাশরুমের চাষ খুব বাড়ছে। যেখানে একটি একক ইউনিটে বছরে ৩০০০ টন উৎপাদন সম্ভব, সেখানে এখন বাণিজ্যিক ইউনিটগুলিতে একসঙ্গে এরূপ ২০টির বেশি ইউনিট তৈরি করে আনুষঙ্গিক কম চলতি খরচে অধিক উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব।

পোয়াল ছাতু, আগেই বলা হয়েছে, একটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জাত (tropical variety)। চীন, মালয়েশিয়া, মায়ানমার (ব্রহ্মদেশ), ফিলিপাইনস্, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে ব্যাপক হারে পোয়াল ছাতুর চাষ হয়। সমস্ত মাশরুমের মধ্যে এটিই সম্ভবত প্রাচীন বাণিজ্যিক মাশরুম। চীনদেশে সর্বপ্রথম **"চাইনিজ মাশরুম "** হিসাবে এর চাষ হয় বলে জানা যায়।

ভারতে প্রথম পোয়াল ছাতুর চাষ হয় ৪০ দশকে তখনকার মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে। এই শ্রেণীর ছাতু চাষে দরকার—তাপমাত্রা ৩০°-৪০° সে. (সর্বোত্তম ৩৫° সে.), বিশেষ করে বৃদ্ধির জন্য। সমতলে গ্রীষ্মকালে খুব সহজেই পোয়াল ছাতুর চাষ করা যাবে।

বিভিন্ন জাতের পোয়াল ছাতুর মধ্যে *Volvariella volvacea, V. diplasia* ও *V. esculenta* খুবই জনপ্রিয়। গ্রামীণ এলাকায় এগুলি সহজেই চাষযোগ্য। এই ছাতু চাষে ঘরের মধ্যেই প্রয়োজনীয় সব কাজকর্ম করতে হয়। তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এতে কোনোরূপ অসুবিধা হয় না।

ধান, গম, বাজরা, যব, ভুট্টার খড়, আখের ছিবড়া, কলার পাতা ইত্যাদি বহুবিধ ফসলের বর্জ্য পদার্থ দিয়ে পোয়াল ছাতু চাষ করা যায়। গ্রাম-বাংলা তথা গ্রামীন ভারতে এসবের কোনো অভাব নেই। তবে ধানের খড় বা পোয়াল/বিচালি ছোট এককে বাণিজ্যিক চাষে খুবই উপযুক্ত। পূর্ব ভারতে এ জিনিসের প্রাচুর্য অনেক। এই শ্রেণীর ছাতু চাষে খুব কম-খরচের কৃষি বর্জ্য পদার্থকে উচ্চ গুণসম্পন্ন খাদ্য তৈরিতে কাজে লাগানো সম্ভব। এছাড়া পরিবেশ দূষণও এতে রোধ করা সম্ভব।

এই প্রকার ছাতু চাষে আর একটা বড় সুবিধা হ'ল, খুব তাড়াতাড়ি ছাতুকে সূর্যের রোদে শুকিয়ে ৬ মাসের জন্য সংরক্ষণ করা যায়। কোনোরূপ স্বাদ, গন্ধ ও গুণমান নষ্ট হয় না। বোতাম ছাতুর ন্যায় পোয়াল ছাতুরও বিশাল আন্তর্জাতিক বাজার রয়েছে, একথা সবার মনে রাখা দরকার। তার কারণ হ'ল, পোয়াল ছাতুর বিবিধ রান্না খাবার হোটেল এবং রেস্টুরেন্টগুলিতে বেশ জনপ্রিয় এবং সারা বিশ্বে তাই পোয়াল ছাতুও সাদা বোতাম ছাতুর মত জনপ্রিয়। চাহিদা তাই যথেষ্ট। তাই এর বাণিজ্যিক রপ্তানি মূল্য অনেক এবং খুব সহজেই বিদেশী মুদ্রা আয় করা সম্ভব। গ্রাম বাংলা তথা গ্রাম-ভারতে পোয়াল ছাতুর একটা বিশাল উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। খরচ খুবই কম, বিশেষ প্রযুক্তি/কলাকৌশল লাগে না। খুব সহজেই গ্রামীণ প্রাকৃতিক প্রচুর সহজলভ্য বর্জ্য পদার্থের দ্বারা করা সম্ভব। প্রতিটি কৃষক

পরিবারের প্রতিটি সদস্য অন্যান্য ফসল চাষ ব্যতীত অনায়াসে এর চাষ করতে পারেন। অশিক্ষিত চাষী, চাষী-বৌ তথা যুবক-যুবতীরাও এর চাষ করতে পারবেন। খুব সহজেই বাড়তি রোজগার তথা পরিবারের পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য ভাল রাখতে পারবেন। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক বিকাশ এতে দ্রুত পরিবর্তন ও উন্নত হতে পারবে। কৃষকদের উন্নতি হলেই দেশ উন্নত হবে—এ কথাটা প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতা, অফিসার ও সুধীজনের প্রথম থেকেই বোধগম্য হওয়া দরকার।

পোয়াল ছাতুর বাজার এবং ফসল তোলার পরবর্তী পরিচর্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধানের খড় বা পোয়াল বা বিচালি যেহেতু কালচে ধূসর রঙের, অনেক খাদ্য ব্যবহারকারীরা এ দেশে এই ছাতুতে অনীহা প্রকাশ করে থাকেন। অথচ এর পুষ্টিমূল্য বহুমূল্য সাদা বোতাম ছাতুর থেকে কোনো অংশেই কম নয়। তাই সব ধরনের বাজে/অন্ধ কুসংস্কার ত্যাগ করতে হবে। বিভিন্ন রান্নার রেসিপি তৈরি করে লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। বিভিন্ন গ্রামীণ/শহরের মেলা, আলোচনাচক্র/জমায়েত/ প্রশিক্ষণ শিবিরে এসব করা যেতে পারে। গ্রামীণ কুটির শিল্প হিসাবে পোয়াল ছাতুর চাষকে সারা ভারতে, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে ব্যাপকহারে জনপ্রিয় করা দরকার।

গ্রামীণ মহিলাদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

ভারতের 'কৃষি বিপ্লব' যা হয়েছে, তা মূলত সবই সেচযুক্ত এলাকায়। খরা-প্রবণ, শুষ্ক তথা অর্ধ-শুষ্ক এলাকায় 'সবুজ বিপ্লবের' প্রযুক্তি কোনোরূপ সাড়া ফেলেনি বা করা সম্ভব হয়নি। অথচ দেশের শতকরা ৭০ ভাগ চাষযোগ্য জমিই এই সমস্যাবহুল অসেচ এলাকায় রয়েছে। স্বভাবতই এসব এলকার কৃষক সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুব খারাপ। দুর্বলতর শ্রেণীর লোকেদের বাস এসব অঞ্চলে। তাদের দৈনন্দিন জীবন খুবই কষ্টের। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই তাদের খাদ্য চাহিদা, স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন, শিক্ষা, বসবাসের ঘরবাড়ির চাহিদা নিত্যই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত হ'ল, এই অবস্থার জন্য মূলত দায়ী 'প্রযুক্তি হস্তান্তর' (Transfer of Technology) বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অসঙ্গতি এবং অব্যবহার। এইসব গরিব কৃষক সম্প্রদায়ের কৃষি উন্নয়নের জন্য দরকার TOT প্রযুক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত কার্যধারা। অর্থাৎ, 'চাষীই প্রথম' বা 'চাষীদের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ'ই (Farmers' Participation approach) আসল কথা। প্রতিটি ধাপে চাষীদের চাহিদা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়ন করা দরকার। 'উতোর চাপান' (Top-down Technology) প্রযুক্তির এখানে কোনো মূল্য নেই। 'নিচ থেকে উঠে আসা প্রযুক্তিই (Bottom-up Technology) আসল কথা। উদ্বৃত্ত, স্বয়ং সম্পূর্ণ (Self-sufficient) এবং অভাবী (deficit) চাষীদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এসব খরা- প্রবণ শুষ্ক এলাকায় পৃথক ব্যবস্থাপত্র, পরিকাঠামোর পরিকল্পনা নেওয়া দরকার।

এসব এলাকায় যে কোনো উন্নয়নমূলক প্রতিটি কাজের পরিকল্পনাতেই চাষীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, চাষী-বৌ বা কৃষক রমণীদের অংশগ্রহণ তথা গ্রামীণ যুবক-যুবতীদের

প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে সার্বিক উন্নয়নের কার্যপদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে সাহায্য করে। যথাযথ সম্প্রসারণ কর্মসূচী বা পদ্ধতি প্রকরণে দুটি মূল কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য—সহজগম্যতা (Approach) এবং ধাক্কা দেওয়া (Thrust)। এদের সঙ্গেই কৃষি উৎপাদন তথা গ্রামীণ উন্নয়নের মূল কথা জড়িয়ে আছে।

ICAR-এর প্রথম সারির সম্প্রসারণ শিক্ষা পদ্ধতিতে জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ পরিষেবা (National Agricultural Extension Service বা NAES) প্রশিক্ষণ ও সাক্ষাৎকার (Training and Visit বা T & V) পদ্ধতি, কিছু ফসল চাষে বিশেষ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা (Special Extension Thrust Programme in some specific crops) এবং বেসকারী সংস্থার কাজকর্ম, প্রতিকাজে চাষীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, কৃষক রমণীদের এবং যুবক-যুবতীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ খুবই জরুরি।

কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের গ্রামোন্নয়ন বিভাগ গ্রাম বিকাশের কাজকর্ম প্রায়ই অ-কৃষি এলাকায় দেখাশুনা করে থাকে। এই বিভাগই সম্প্রসারণ প্রকল্পগুলিতে যেসব লোকেরা দারিদ্র সীমার নিচে থাকে (যেসব পরিবারের বার্ষিক আয় ৬ হাজার টাকার নিচে), তাদের সাহায্যের জন্য কাজ করে থাকে।

এইসব প্রকল্পের মধ্যে (১) সংস্থান বা উপায় এবং আয়বৃদ্ধি প্রকল্প (নিবিড় গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের মত), (২) বিশেষ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (খরা-প্রবণ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, মরুভূমি উন্নয়ন প্রকল্প), (৩) বিকল্প আয় বৃদ্ধিতে, কাজের প্রকল্প (NREP) বা জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প, গ্রামীন ভূমিহীন কর্মসংস্থান প্রকল্প, ইত্যাদি প্রধান। এই ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী। এছাড়া দেশে প্রায় ৫০০০ এর বেশি NGOS বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় ১০০০ এর বেশি NGOS এখন গ্রামীণ এলাকায় সারা দেশে কাজ করছে। কমবেশি এরা বিভিন্ন কাজে প্রত্যক্ষ অংশীদার। সরকারী তথা বিদেশী আনুকূল্যে তথা অন্যান্য সংস্থার আর্থিক সাহায্যে এসব NGOS সঠিক গ্রামোন্নয়নে কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন কার্যকরী বিভাগগুলির সঙ্গে এদের একটা যোগসূত্র রয়েছে। এসব বিভিন্ন সম্প্রসারণ পদ্ধতির সঙ্গে এদের কাজের ধারা একটা সাধারণ বিশেষত্ব বহন করে থাকে। প্রকল্প অধিকর্তা, কৃষি বিজ্ঞানী, প্রশাসক, উন্নয়ন কর্মী, উপকরণ সরবরাহকারী সংস্থা এবং চাষী, চাষী-বৌ তথা যুবক-যুবতী সবাই এই উন্নয়নমূলক কাজের সমান অংশীদার।

কৃষিতে কৃষক রমণীরা অনেকে বিনা মাহিনায় শ্রমমূলক কাজ করে থাকেন, বিশেষ করে শুষ্ক এবং খরাপ্রবণ সমস্যাবহুল এলাকায়। তাঁদের অন্তর্ভুক্তি এবং অবদান (বিভিন্ন কৃষিকাজে ও অকৃষি কাজে) সংসারের অন্যান্য কাজ থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এসব কৃষক রমণীদের বিভিন্ন সময়ে চাহিদা এবং প্রয়োজন-মাফিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি। অন্যান্য প্রশিক্ষণের সঙ্গে এদের মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ খুবই ব্যবহারিক। তাই গবেষণা, শিক্ষা, সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণে কৃষক রমণীদের সর্বত্রই অন্তর্ভুক্তিকরণ অত্যাবশ্যক। বিভিন্ন কৃষি বিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়/গ্রামীণ ক্লাব এব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

দশম অধ্যায়

মাশরুম চাষ—ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও সমস্যা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাশরুম চাষের-প্রতি দিন দিন আগ্রহ এবং উৎসাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন জাতের ভোজ্য মাশরুম চাষ নিয়ে আজ ব্যাপক সমীক্ষা, গবেষণা এবং ধ্যান-ধারণা বাড়ছে।

সম্প্রতি মাশরুম চাষ বিষয়ে ভারতে ক্রমশ মনোযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়ে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ও আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এতে আগ্রহী হচ্ছে এবং চাষীদের বিশেষ প্রশিক্ষণসহ গ্রামেগঞ্জে এর চাষ হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার আজকাল এ ব্যাপারে তৎপর হয়েছে।

এখনো ভারতে মাশরুম চাষের ব্যাপক বিস্তার ঘটেনি। অথচ এর কিছু সমস্যা থাকলেও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা প্রচুর। সাধারণের মধ্যে তাই এর ব্যাপক প্রচার দরকার। এর জন্য চাই সহজ সরল চাষ পদ্ধতির বইপত্র, পুস্তিকা, আর্থিক তথা অন্যান্য পরিকাঠামো এবং সহায়তা। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী তথা বেসরকারী দপ্তর, গ্রামীণ কৃষি চর্চামণ্ডল ও ক্লাবগুলির আন্তরিক প্রয়াস দরকার।

সম্প্রতি অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে/কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে "মাইক্রোবায়োলজি" বিভাগে মাশরুম চাষের উপর শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে। উদ্ভিদ বিদ্যার অন্তর্গত এই বিভাগের সঙ্গে শস্য রক্ষাবিদ্যা, উদ্যানবিদ্যা, অ্যাগ্রোনমি বা শস্যচাষ বিদ্যা, কীটতত্ত্ববিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে একসঙ্গে গবেষণা করে মাশরুম চাষের সার্বিক উন্নতির প্রয়োজন।

আমাদের সামগ্রিক পরিবেশে মাশরুম চাষের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। শুধু আর্থ-সামাজিক উন্নতি বিধানই নয়, দেশের আপামর গরিব শ্রেণীর উন্নতি বিধানে, স্বাস্থ্য উদ্ধারে মাশরুমের একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। সারা বিশ্ব তথা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি আজ অপুষ্টির শিকার। খাদ্য সঙ্কট মোচনে মাশরুমের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সম্প্রতি আমাদের দেশ খাদ্য উৎপাদনে স্ব-নির্ভর হয়েছে। এখন তাই আমাদের স্ব-নির্ভরতা এবং উচ্চমানের প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদনের সময় এসেছে। মাশরুম চাষে এই দুটি কাজই সম্ভব। দেশের সকল শ্রেণীর লোকেরা এতে শামিল হতে পারেন। দিন দিন তাই মাশরুম খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনেক। এখন প্রয়োজন, একটি সুসংবদ্ধ সম্প্রসারণ কর্মসূচী, প্রশিক্ষণ, পরিকাঠামো বৃদ্ধি ও বিস্তার, আর্থিক অনুদান তথা সাহায্য এবং ঋণের ব্যবস্থা, বাজারজাত করার ব্যবস্থা এবং রপ্তানি ইত্যাদি। ছোট অথবা বড় আকারের প্রকল্প নেওয়া যাবে এই চাষে। মাশরুম অতি সহজেই গ্রামীণ কুটির শিল্পে পরিণত হতে পারে।

বিভিন্ন কৃষি-জলবায়ু অঞ্চলে মাশরুমের চাষবাস

বর্তমানে এখানে সাদা বোতাম ছাতু, ধিংড়ি বা ঝিনুক ছাতু এবং পোয়াল ছাতুর বিভিন্ন জাতের চাষবাস হচ্ছে। এইসব ছত্রাকের জন্য দরকার যথাক্রমে ১৫°-২২° সে., ২০°-২৮° সে. এবং ২৮°-৪০° সে. তাপমাত্রা। দেশের সব অঞ্চলেই এই তাপমাত্রা রয়েছে। অন্তত বছরের ৪-৬ মাস ধরে অতি সহজে তাই মাশরুম চাষ সম্ভব।

পাহাড়ী উচ্চ এলাকায়ও (এমনকি ৬০০ মিটারেরও বেশি) বিভিন্ন জাতের বোতাম ছাতুর ২টা ফসল (*Agaricus bisporus*) এবং ৩টা ফসল (*A. bitorquis*) নেওয়া সম্ভব। ৬০০ মিটার থেকে ২০০ মিটার উঁচু এলাকায়ও এইসব কাজের মাশরুম চাষ ভাল ভাবে একটু কৃত্রিম উপায়ে প্রাকৃতিক জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যবস্থা করে সারা বছর চাষ সম্ভব।

একইভাবে তরাই এলাকায়ও বোতাম ছাতুর ২টা ফসল, ধিংড়ি ছাতুর ৪টা ফসল এবং পোয়াল ছাতুর ১-২ টা ফসল নেওয়া সম্ভব। এইভাবে সব মিলিয়ে সারাবছরে বিভিন্ন জলবায়ুর অবস্থানে, সমতল তথা পার্বত্য এলাকায় অনেকগুলো মাশরুম ফসল উৎপাদন করা সম্ভব।

বিভিন্ন জৈব পদার্থের যোগান

ভারতের সর্বত্র ধান ও গমের খড়ের সঙ্গে ভুট্টা, যব, বাজরা, আখের ছিবড়া, পোলট্রিসার ও অন্যান্য জৈব পদার্থের অভাব নেই। এদের খুব ভালভাবে মাশরুম চাষে ব্যবহার করা সম্ভব। অধিকাংশ এলাকায় বিশেষ করে পূর্ব ভারতে ধান ও গমের খড় অনেকাংশে জ্বালানি হিসাবে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এইসব জৈব পদার্থের সময়মত যথাযথ পরিচর্যা ও যোগান দিলে মাশরুম চাষের সমস্যা কোনো দিনই হবে না।

বীজ বা স্পনের সরবরাহ/যোগান

বিভিন্ন মাশরুমের বীজ বা স্পনের উৎপাদন এবং যোগানের উপর খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার। কারণ কোনো অবস্থাতেই পরিকল্পনা গ্রহণের পর হিসেবমত বিভিন্ন শ্রেণীর/জাতের মাশরুমের বীজ বা স্পন্ যোগানের অভাব থাকা চলবে না। সারা দেশে স্পন উৎপাদন এবং তার সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাল মাশরুমের চাষ ও উৎপাদন নির্ভর করে উচ্চ গুণমানের স্পনের সরবরাহ, পাস্তুরাইজ করা কম্পোস্ট তৈরি, উপযুক্ত পরিবেশ পরিচর্যা, দক্ষ শ্রমিক এবং আর্থিক স্বয়ং সম্পূর্ণতার উপর। দেশের প্রতিটি রাজ্যের প্রতিটি কেন্দ্রে তাই মাশরুমের বীজ উৎপন্নকারী ভালো ল্যাবরেটরি থাকা অত্যাবশ্যক। এতে বিভিন্ন জাতের বীজ তৈরি করে যথা সময়ে প্রয়োজন এবং চাহিদা মত চাষীদের বাড়ির দোরগোড়ায় বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করা যাবে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষায়তন, বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী ল্যাবরেটরিগুলিতে এই পছন্দমত বীজ/স্পন তৈরির দায়িত্ব সহ আর্থিক দায়িত্ব সামাল দিতে হবে।

বাজারজাত ব্যবস্থা (Marketing)

যেহেতু মাশরুম তোলার পর বেশিদিন তাজা অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায় না, পচে নষ্ট হয়, তাই ফসল তোলার সঙ্গে সঙ্গেই কিছুটা নিজেদের খাদ্যের জন্য রেখে, বাকিটা ২-৩ দিনের মধ্যে বাজারজাত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। বিভিন্ন উপায়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থা (শুকনো করে বা ক্যানিং করে) করতে হবে। ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীরা স্থানীয় বাজারে খুবই কম দামে তাঁদের উৎপাদন ফসল বিক্রি করে দেন। কেবলমাত্র বড় চাষীরা ক্যানিং ব্যবস্থা করে তাদের উৎপন্ন ফসল সরাসরি স্টার হোটেলে, রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য জায়গায় উচ্চমূল্যে বিক্রি করে দেন। এছাড়া বিভিন্ন এজেন্টদেরও ন্যাহ্য মূল্যে বিক্রি করা যায়। বিদেশের বাজারে রপ্তানি লাইসেন্স থাকলে আজকাল অনেক লাভে তা বিক্রি করা যাবে। এর জন্য প্রয়োজন রপ্তানি সুবিধা, পরিকাঠামো ব্যবস্থা এবং সবার সহযোগিতা। ছোট বা বড় সব চাষীদের জন্য ন্যাহ্য দামে ফসল বাজারজাত করার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। সমবায় ভিত্তিতে গ্রামের ছোট চাষীরা এইভাবে উৎপাদন এবং বাজার জাত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। সরকারের এ বিষয়ে যথেষ্ট যত্ন এবং সুযোগ-সুবিধার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

কম্পোস্ট তৈরি

মাশরুম চাষে এক সঙ্গে অনেকখানি উপযুক্ত পাস্তুরাইজড় কম্পোস্ট তৈরির চেম্বার তৈরি করে সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে। ২৮ দিনে দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরি এখন ২০-২২ দিনে করা যাচ্ছে। সাধারণত ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীদের কম্পোস্ট তৈরির ঘেরা ছাউনি এবং পাস্তুরাইজড় চেম্বার/সুড়ঙ্গ থাকে না। প্রতি সেন্টারে তাই এরূপ ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। প্রতি সেন্টারে কম পক্ষে ৩টি পাস্তুরাইজড় সুড়ঙ্গ (tunnels) থেকে ২৫ টন উন্নত কম্পোস্ট প্রস্তুত করা যাবে। এলাকার ছোট-বড় সব মাশরুম চাষীকে তখন খুব সহজেই এই উন্নত কম্পোস্ট সরবরাহ করা যাবে।

সমস্যাবলী

প্রয়োজনীয় সঠিক ব্যবস্থাসহ উন্নত বাণিজ্যিক মাশরুম চাষে প্রতিষ্ঠা করতে কতকগুলি সমস্যা দেখা দেয়। এগুলি এভাবে সাজানো যেতে পারে—

(১) এদেশে মাশরুম চাষীরা যথেষ্ট শিক্ষিত নয়। বাণিজ্যিক চাষে তারা সহজে এই চাষের লাভালাভ ও উন্নতি চট্ করে বুঝতে পারে না।

(২) প্রেরণার অভাবে অনেক সময় সম্প্রসারণ পদ্ধতি ঠিকমত কাজ করতে পারে না। গতানুগতিক চাষ-পদ্ধতি বাদ দিয়ে মাশরুম চাষীকে আধুনিক ধ্যান-ধারণার আলোকে আনতে হবে। তাদের প্রেরণা, দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বশেষে লাভালাভ ও উন্নত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

(৩) মাশরুম চাষে অভিজ্ঞ লোকের অভাব। সারা দেশে এখনো যথেষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই।

(৪) উন্নতমানের স্পন্ সরবরাহ আর একটি বাধা। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। উন্নতমানের বীজ তৈরি ও সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ ও কম-খরচের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৫) বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকা চাই। তা নাহলে মাশরুম চাষ মার খাবে। যখন তখন বিদ্যুৎ বন্ধ হলে এই শিল্পের বড় ক্ষতি হবে।

(৬) প্রয়োজনমত সরল কিস্তিতে ঋণের ব্যবস্থা থাকা চাই, বিশেষ করে গ্রাম ও শহরের ছোট/বড় সব চাষীদের জন্যই।

(৭) প্রশিক্ষণের অভাব, অর্ধ-শিক্ষা মাশরুম চাষের আর একটি সমস্যা, বিশেষ করে ছোট চাষীদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। অনেক ক্ষেত্রে তাদের মাশরুম চাষ খুবই অস্বাস্থ্যকর এবং অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় হয়। এতে বিভিন্ন রোগ-পোকার প্রাদুর্ভাবে ফলন মার খায়।

(৮) বাজারজাত করার সুষ্ঠু ব্যবস্থা এখনো গড়ে ওঠেনি। এই ফসল যেহেতু তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়, তাই মাশরুম তোলার পরই সঙ্গে সঙ্গে বাজারে পাঠাবার ব্যবস্থা চাই। সারা দেশে এই ব্যবস্থাকে শক্তিশালি করা দরকার।

(৯) যথাযথ সংরক্ষণ ও ক্যানিং ব্যবস্থা এখনো গড়ে ওঠেনি। সরকারী ও বেসরকারীভাবে তা গড়ে না তুললে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মাশরুম চাষীদেরই ক্ষতি বেশি হবে।

(১০) ভালভাবে ফসল তোলার পরবর্তী পরিচর্যা করে ন্যায্য দামে বিক্রি করা চাই। বাইরের বাজারে এর দাম ও লাভ অনেক বেশি। রপ্তানি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে বিভিন্ন জায়গা থেকে ন্যায্য দামে ফসল কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সারা বিশ্বে ভোজ্য মাশরুমের উৎপাদন চিত্র নিম্নরূপ—

সারণী-১৩ : ভোজ্য মাশরুমের উৎপাদন চিত্র (তাজা ফসলের ওজন, মেট্রিক টন)

শ্রেণী	মাশরুমের প্রকার			
	দেশ	বোতাম ছাতু	অন্যান্য মাশরুম	সমস্ত মাশরুম
প্রথম	চীন	১,৭০,০০০	২০,৭৫,৮০০	২২,৪৫,৮০০
	আমেরিকা	৩,৪১,৮৩০	২,৮৮৭	৩,৪৪,৭১৭
	জাপান	২,৭০০	৩,৩৩,৭৩০	৩,৩৬,৪৩০
	ফ্রান্স	২,৩১,০০০	১,০০০	২,৩২,০০০
	হল্যান্ড	১,৬৫,০০০	৩৫০	১,৬৫,৩৫০
দ্বিতীয়	ইউ. কে.	১,১৮,০০০	—	১,১৮,০০০
	ইটালি	১,০২,০০০	—	১,০২,০০০
তৃতীয়	থাইল্যান্ড	৬,০০০	৭৪,১৫৩	৮০,১৫৩
	ইন্দোনেশিয়া	২০,০০০	৬০,০০০	৮০,০০০
	দঃ কোরিয়া	৮,৯৯০	৬৫,৮০৮	৭৪,৭৯৮
	স্পেন	৬২,৫০০	৫,০০০	৬৭,৫০০

শ্রেণী	দেশ	বোতাম ছাতু	অন্যান্য মাশরুম	সমস্ত মাশরুম
	পোল্যান্ড	৬৫,০০০	১০০	৬৫,১০০
	জার্মানি	৫৬,০০০	১০০	৫৬,১০০
	কানাডা	৫৩,১০০	১৫০	৫৩,২৫০
	তাইওয়ান	৬,৫০০	৪৪,৫০০	৫১,১০০
	আয়ারল্যান্ড	৪২,০০০	—	৪২,০০০
	বেলজিয়াম	৩০,০০০	—	৩০,০০০
	অস্ট্রেলিয়া	২৫,৫১০	২০	২৫,৫৩০
	হাঙ্গেরী	১৮,০০০	২,৫০৫	২০,৫০৫
	মেক্সিকো	১০,৩৩২	৩৬০	১০,৬৯২
চতুর্থ	ডেনমার্ক	৮,০০০	—	৮,০০০
	ভারতবর্ষ	৬,০০০	১,০০০	৭,০০০
	অন্যান্য দেশ	৪১,৭১০	১৫,৬৫১	৫৭,৩৬১
	সমস্ত দেশ	১৫,৯০,১৭২	২৬,৮৩,১১৪	৪২,৭৩,২৮৮

(Source : Chang, S., T., J., A, Buswell and S. W. Chiu, 1993).

মাশরুম চাষে একটা জিনিস সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে চাষীরা বাজারে সুরক্ষা-মূলক দাম সব সময় পেতে সক্ষম হয়। সমীক্ষা করে দেখা গেছে—দিল্লি, মুম্বাই এবং কোলকাতায় বোতাম ছাতুর বাজার দাম শীতকালে প্রতি কেজিতে ২০ টাকা কম থাকে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সাধারণত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে মাশরুমের চাষ হয়। বড় চাষীদের নিজস্ব হিমঘর (Cold storage) থাকে। এসব ক্ষেত্রে বাজার মূল্যের এ ধরনের অসুবিধা থাকার কথা নয়।

কোলকাতায় ১৯৯১ সালে বোতাম ছাতুর খুচরো বাজার দাম কেজি প্রতি ১২৫ টাকা ছিল। কিন্তু ১৯৯৩ সালে তা নেমে দাঁড়ায় ৬৪ টাকায়। এখনো এখানে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অনেক কম।

গ্রীষ্ম এবং নাতিশীতোষ্ণ এলাকায়, ভারতের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মাশরুম চাষীরা শীতকালীন আবহাওয়ার সুবিধা গ্রহণ করে ঠিকমত ঠিক সময়ে চাষ শুরু করতে পারে না। এদের কিছু উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে (*A. bisporus* এবং *A. bitoriques* জাতের বোতাম ছাতু)।

ধিংড়ি এবং পোয়াল ছাতুর উন্নত চাষ প্রযুক্তি ব্যবহারে বোতাম ছাতু চাষের মত এতটা ব্যাপকতা নেই। অথচ ক্রমশ সারা দেশের গ্রাম-গঞ্জে এই দুটি ছাতু চাষের উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়ছে। এর প্রধান কারণ হ'ল বোতাম ছাতু চাষের ন্যায় ধিংড়ি এবং পোয়াল ছাতু চাষ খরচ বহুল নয়। খুব কম খরচের প্রযুক্তি ব্যবহারে সহজেই এদের চাষ করা যায়।

ভবিষ্যৎ মাশরুম চাষ বৃদ্ধিতে মাশরুমের ফলনকে নানাবিধ খাবার তৈরির কাজে ব্যবহার করে মুখরোচক এবং আকর্ষণীয় করতে হবে। সস্, আচার, নুডল্, জ্যাম্, জেলি,

বিস্কুট, ইন্স্ট্যান্ট্ সুপ্, ফ্লেক্স, চিপস্, রান্নার পাউডার, ঘন দ্রবণ ইত্যাদি তৈরি করে মাশরুমের বিবিধ ব্যবহার করা যায়। এগুলি সবার কাছেই আকর্ষণীয় হয়। রান্নার এইসব উন্নতিতে বড় চাষীরা আজকাল বাণিজ্যিক মাশরুম চাষে উৎসাহী হচ্ছেন, বিশেষ করে ধিংড়ি এবং পোয়াল ছাতু চাষে।

এখনো ভারতের বিভিন্ন এলাকার সব থেকে দুর্বলতর শ্রেণীর চাষীরা মাশরুম চাষের সব থেকে সহজতম প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। অথচ বড় চাষীরা সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় চাষঘরের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে জটিল মাশরুম চাষ করছেন। গরিব চাষীরা আগে নিজেদের মাশরুম খাদ্য চাহিদা মেটায়। তারপর অতিরিক্ত উৎপাদন বাজারে বিক্রয় করে দেয়। বড় মাশরুম চাষীরা বিদেশী রপ্তানি করে বিদেশী মুদ্রা অর্জনে বেশি লাভ করেন।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং মাশরুমের চাষবাস নিম্নলিখিত কারণের উপর নির্ভরশীল—

(১) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি এবং সবাইকে অন্যান্য উদ্দীপনা প্রদান। বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদ্‌গণ চাষীদের সর্বদা গবেষণার সুফল ও প্রযুক্তি উন্নয়ন বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করবেন—এই ধারণাই সবাই পোষণ করে।

(২) উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপের কাজকর্ম ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ—ট্যাক্স এবং অন্যান্য বাধা আরোপ তথা মাশরুম চাষীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান।

(৩) মাশরুম বাণিজ্য এবং ব্যবসাকে দেশের লোকেদের যথাযথ উন্নতির জন্য সঠিক পথে পরিচালনা করা।

(৪) দুর্বলতর শ্রেণীর লোকেদের জন্য সামাজিক বিচার ও তাদের উন্নতির স্বার্থে একটা আর্থিক তথা আনুষঙ্গিক সাহায্য দেওয়া উচিত।

(৫) খরাপ্রবণ, শুষ্ক এলাকায় মাশরুম চাষের ব্যাপক আয়োজন এবং প্রস্তুতি নিলে দেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে।

একাদশ অধ্যায়

মাশরুমের রেসিপি বা ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী (Recepes of Mushroom)

মাশরুম থেকে বিভিন্ন প্রকার উৎকৃষ্ট মুখরোচক ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা যায়। কিছু মাশরুমের রেসিপি নিচে দেওয়া হ'ল।

(১) মাশরুমের স্যুপ্

তাজা মাশরুম ৫০০ গ্রাম, বাটার ৫০ গ্রাম, ময়দা ২ চা-চামচ পূর্ণ, পরিমাণমত লবণ, গুঁড়া মশলা (এলাচ, লাল শুকনো লঙ্কা, দারুচিনি এবং গোলমরিচ) ৪ গ্রাম, দুধ ১ লিটার।

তাজা মাশরুম পরিষ্কার করে ছোট ছোট করে কাটুন। একটা কড়াইতে বাটার গলান এবং মাশরুমের কুঁচি ঢালুন। দুধ ঢালুন এবং মিশ্রণটিকে ৫-৭ মিনিট ফোটান। ময়দা ভাল করে একটা ছোট পাত্রে ঠাণ্ডা জলে গুলে নিয়ে মাশরুম মিশ্রণে ঢালুন, ঘন করার জন্য। ২-৩ বার ফুটিয়ে পরিমাণমত লবণ ও মশলা গুঁড়ো দিন। গরম গরম পোসেলিনের বাটিতে সার্ভ করুন, মাশরুমের স্যুপ্ খেতে খুব সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর। ক্ষুধা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

(২) মাশরুমের ওমলেট্

ডিম ২টি, ছোট ছোট করে কাটা তাজা মাশরুম ৩-৪টি, বাটার ২৫ গ্রাম।

একটি প্যানে বা কড়াইতে ছোট ছোট করে কাটা মাশরুম দিন। বাটার দিন, একটু লবণ (পরিমাণ মত) স্বাদের জন্য দিন। গোলমরিচ দিন। মাশরুমকে ঈষৎ ফুটান। ডিম ফেটিয়ে ঢালুন এবং ভাজুন। ভাঁজ করার জন্য উল্টেদিন এবং কয়েক সেকেন্ড রাখুন। গরম অবস্থায় খেতে দিন।

(৩) মাশরুমের পকোড়া

মাঝারি আকারের মাশরুম (বোঁটা বিহীন) ৬টা, ডিম ১টা, ব্যাসন (ছোলার) ১০ গ্রাম, বেকিং পাউডার এক চিমটে, লবণ ও লাল শুকনো লঙ্কা স্বাদের জন্য দিন। পাতলা সাদা রুটির টুকরো এবং ভাজার জন্য তেল রাখুন।

ডিম ফেটিয়ে নিয়ে তাতে ছোলার ব্যাসন, বেকিং পাউডার, লবণ, লাল শুকনো লঙ্কা দিয়ে ভাল করে নাড়ুন। প্রয়োজন হলে একটু জল দিন। টুকরো রুটির উপর ঢেলে গোল করে গড়ান। তেল গরম হলে এবার একটু করে নিয়ে ভাজুন। ধূসর রঙের হলেই নামিয়ে রাখনু ও গ্যাসের আগুন কমান। গরম গরম খেতে দিন।

(৪) মাশরুম পোলাও

মাশরুম ২৫০ গ্রাম, চাল (সরু সুগন্ধি) ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ১ টা ছোট, জিরা হাফ চা-

চামচ, এলাচ ১ টা, ধনেপাতা ২টা, লবঙ্গ ১-২ টা, কালো মরিচ ২-৩ টা, ঘি ২ চামচ, লবণ পরিমাণ মত।

তাজা মাশরুম ধুয়ে লম্বালম্বি কাটুন। পরিষ্কার ভেজা সরু সুগন্ধি চাল ছেঁকে ১০ মিনিট রাখুন। ঘি গরম করে মাশরুম হাল্কা করে ভাজুন। ভেজে এক পাশে রাখুন। একই ঘি-এর সঙ্গে জিরা, এলাচ, লবঙ্গ, কালো মরিচ ও ধনেপাতা দিন। জিরাবীজ শব্দ করলে পেঁয়াজ কুঁচি দিন। হাল্কা বাদামী রঙ হতে দিন। তারপর চাল দিন ও চালের দ্বিগুণ পরিমাণ জল ও লবণ পরিমাণ মত দিন। চাল ফুটতে শুরু করলে মাশরুমের লম্বা লম্বা টুকরো দিন। কম আগুনে যতক্ষণ পর্যন্ত পোলাও তৈরি না হয় ফোটান।

(৫) আলুর পুর দিয়ে মাশরুম

খুব সরু করে কাটা মাশরুম ৫০০ গ্রাম, সরু করে কাটা পেঁয়াজ ১২০ গ্রাম, তাজা লেবু রস ৩ চা-চামচ, বাটার ১২৫ গ্রাম, পনির ১২.৫ গ্রাম এবং লবণ পরিমাণ মত।

একটা কড়াইতে বাটার গলান, মাশরুম ও পেঁয়াজ দিন। হাল্কা করে ভাজুন। লেবু রস ও লবণ নাড়বেন না। জল শুকনো না হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। এবার মাঝারি আকারের আলু নিন, সেদ্ধ করুন যাতে বাইরের অংশ নরম হয়ে যায়। আলুর খোসা ছাড়িয়ে ছেঁচে ফেলুন এবং মাশরুমের মিশ্রণের সঙ্গে নাড়ুন। ভালভাবে বাদামী রং হলে গরম গরম খেতে দিন। আলুর মণ্ড সোজা করে মাশরুম মিশ্রণের উপর উনুনে রাখা পাত্রে দিয়ে রান্না করতে হবে। এতেই আলুর পুর দিয়ে মাশরুম তৈরি হবে।

(৬) মাশরুম টোস্ট

কাপ-মাশরুম ২-৩ টি বড়, বাটার ৩০ গ্রাম, ডিম ১টি, রুটির টুকরো।

২-৩ টি বড় কাপ মাশরুম তাদের গিলসহ (ঘন পিঙ্ক রঙের দেখতে হয়) নিন। বোঁটা বাদ দিন। একটু খানিক পার্সলি পাতা ও পেঁয়াজ ১টা ছোট নিন। লবণ ও গোল মরিচ দিন। স্বাদের জন্য ঘি বা বাটার দিন। একটা ডিম ভেঙে ফেটান। অল্প রুটির টুকরো এতে দিন। ভাল করে নাড়তে থাকুন। এবার ঈষৎ ফুটন্ত অবস্থায় মাশরুম স্টকের সঙ্গে ঢালুন। যখনই মিশ্রণটি ঘন হবে, মাশরুম ক্যাপগুলি দিয়ে দিন। ৪-৫ মিনিট সেঁকুন। গরম গরম খেতে দিন।

(৭) মাশরুম ও মটরশুটি

মাশরুম ২০০ গ্রাম, মটরশুটি ২০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ১ টা ছোট, টমাটো ১ টা মাঝারি, ঘি ১ চা-চামচ, জিরা ১/২ চা-চামচ, গরম মশলা ১/৪ চা-চামচ, লবণ পরিমাণ মতো, সবুজ কাঁচা লঙ্কা ১-২ টি।

মাশরুম ধুয়ে ২ টুকরো করে লম্বালম্বি কাটুন, মটরশুটির খোসা ছাড়ান। আগুনে কড়া বসিয়ে ঘি ঢালুন, জিরা দিন। জিরা শব্দ হতে শুরু করলে পেঁয়াজ, টমাটো, মাশরুম, খোসা ছাড়ানো মটর দানা, লবণ এবং ১/২ চা-চামচ হলুদগুঁড়ো দিন। ভাল করে মিশ্রণটি নাড়ুন ও স্বল্প আগুনে রান্না করুন। জল শুকিয়ে গেলে মটর রান্না হয়ে যাবে। তখন পাত্রে ঢালুন। গরম মশলা তৈরি খাবারে দিন। উনুনে আগুন নেভাবার আগে স্বল্প ক্রিম (মাখন) দিন।

যদি মাখন না পাওয়া যায়, ২ চা-চামচ ভুট্টার ময়দা দিন। এবার তৈরি হয়ে যাবে।

(৮) মাশরুম ও পনীর

মাশরুম ৫০০ গ্রাম, পনীর ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ ১০০ গ্রাম, টমাটো ১০০ গ্রাম, ঘি ২ চা-চামচ, লবণ পরিমাণ মত, গরম মশলা ১ চা-চামচ।

মাশরুম ধুয়ে দুভাগে লম্বালম্বি করে কাটুন, পনিরকে ২ কিউব করে কাটুন, পেঁয়াজ ছোট করে কাটুন এবং টমাটো ছোট করে কাটুন, ঘি গরম করুন কড়াইতে বা প্যানে। পেঁয়াজ দিন, হলদে হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তারপর টমাটো দিন। ৫ মিনিট উষ্ণ তাপে ফোটান। মাশরুম, পনির এবং লবণ দিন। অল্প আগুনে রান্না করুন, যতক্ষণ পর্যন্ত না মাশরুমের জল শুকিয়ে যায়। গরম মশলা দিয়ে খেতে দিন।

(৯) মাশরুম সামোসা/সিঙ্গাড়া

পুরের জন্য : মাশরুম ২০০ গ্রাম, কুচো করে কাটা পেঁয়াজ ২ টি মাঝারি / ছোট, সবুজ কাঁচা লঙ্কা কাটা—১ চা-চামচ, ধনে পাতা কাটা ১ চা-চামচ, লবণ পরিমাণ মত।

উপরের ঢাকনার জন্য ঃ সাদা ময়দা ২৫০ গ্রাম, ঘি ৩ চামচ, লবণ ১/২ চা-চামচ।

মাশরুম ছোট করে কেটে নিন। পেঁয়াজ কাটুন। প্যানে ঘি গরম করে মাশরুম, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, লবণ ঢালুন। জল শুকিয়ে গেলে আগুন নিভিয়ে দিন। ধনেপাতা দিন। এতেই উপাদান তৈরি হবে।

ঢাকনা/খোলের জন্য ময়দা চালুনি দিয়ে ছেঁকে, ঘি দিয়ে নরম করে ডলাই করুন এবং একটু জল মেশান—প্রয়োজন মত। এবার ছোট ছোট বল করে গোল করে বেলুন, চাপাটির মত। প্রতিটি দুটি অংশে কাটুন। একটি অংশ হাতে নিয়ে সামোসার মশলা পুরে দিন ও গোল করে মুখ বন্ধ করুন। ঘি গরম করুন ও ভাজুন। গরম গরম খেতে দিন। টমাটো সস বা সবুজ চাটনি দিয়ে খেতে ভাল লাগে।

(১০) মাশরুম চাটনি

তাজা মাশরুম ৫০০ গ্রাম, লবণ ২০ গ্রাম, বাটা আদা ৫ গ্রাম, কাটা পেঁয়াজ ২০ গ্রাম, গুঁড়ো জৈত্রী ২ গ্রাম, মেথি গুঁড়ো ১০ গ্রাম, গুঁড়ো সাদা লবঙ্গ ২০ গ্রাম, লাল শুকনো লঙ্কা ১০ গ্রাম, গ্ল্যাসিয়াল অ্যাসেটিক অ্যাসিড (ভিনিগার) ১০ গ্রাম, সরষের তেল ১০০ গ্রাম।

বোতাম ছাতু ব্যবহার করুন। ঠাণ্ডা জলে কয়েক মিনিট ডুবিয়ে রাখুন এবং পরে ছেঁকে নিন। একটা প্যানে পরিষ্কার মাশরুম রাখুন। লবণ, লঙ্কা, জৈত্রী, মেথি, লাল লঙ্কা দিয়ে ভাল করে মেশান। পেঁয়াজ ভেজে এবং তেলে হলুদ দিয়ে হাল্কা ধূসর রং করুন। তারপর মাশরুম মেশান। ভিনিগার মেশান ও ১০ মিনিট ধরে রান্না করুন। ছোট ছোট গ্লাসের জারে সম্পূর্ণ এবার ঢালুন। একটা জিনিস বিশেষভাবে যত্ন নিতে হবে, যাতে মশলাগুলি সমানভাবে জারের মধ্যে মেশে। এইভাবে কয়েকদিন জারগুলি রেখে দেওয়ার পর ডিনার বা লাঞ্চে সার্ভ করুন। চমৎকার মাশরুমের চাটনি খুবই জনপ্রিয়।

গ্রন্থপঞ্জি (RERERENCE)

1. The Agri-Horticultural Society of India; Mushroom Cultivation Training Centre, 1, Alipore Road, Kolkata 700 027.
2. Anderson, E.E. and Fellers, C.R. (1942). The Food Value of Mushrooms (A. Campestris). Proc. Amer. Soc. Hort. Sci. 41:301.
3. Agarwala, R.K. (1973). How to grow mushroom? Indian J. Mushroom 1 (1) : 17-21.
4. Bhowmik, K.L., Santra, S. K. and Bhowmik, Niladri (1994). Mushroom Cultivation Manual. Action Research Institute, 47D, Palm Avenue, Kokata 700 019.
5. Bhowmik, K.L., Samit and Chandra Sekher, M. T. (1992). Mushroom Spawn Production Manual, Action Research Institure, 47D, Palm Avenue, Kolkata 700 019.
6. B.C.S. Mushrooms–Fresh / Processed Button Mushrooms, 9, Ramsevak Mullick Lane, Kolkata.
7. Bahl, Nita (1984). Hand Book of Mushrooms, Oxford & IBH, New Delhi.
8. Bose, S.R. and Bose, A.B. (1940). An account of edible mushrooms of India, Sci. & Cult. 6:141-49.
9. Cooke, R.C. (1977) Fungi, Man and His Environment, Longman, London and New York, pp. 144.
10. Chang, S.T. and Hayers, W.A. (1978). The Biology and Cultivation of Edible Mushrooms, A.P., New York.
11. Das, P.K. and Jana, B.L. (1995). Synopsis of Mushroom–A Project Report sent to Publication Division, Ministry of Information & Broadcasting, Govt. of India, Patiala House, New Delhi 110 001.
12. Dang, R.L. and Singh R. P. (1978). Preservation of Mushrooms, Indian Mush. Sci. 1:215-24.
13. Flegg, P.B. (1992). Future strategies for mushroom production. Mushroom Res. 1(1):13-18.
14. Gupa. Y. and Dhar B.L. (1993). Spawned casing for increased mushroom yield in *Agaricus bisporus* under seasonal growing conditions in India. Mush. Res. 2:25-28.
15. Hayes, W.A. and Addad N. (1976). The Food value of the cultivated mushroom and its importance to the mushroom industry. The Mushroom J. 40:104-110.
16. Indian Farmers' Digest, January 1995, Special Issue : On Mushroom Production, Part-II, Published by Director Communication,

G. B. Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar-- 263145, India.

17. Jandaik, C.L. and Goyal, S.P. (1995). Farm and Farming of Oyster mushroom (Pleurotus species), Indian Farmers' Digest, January 1995, pp 72-78.
18. Jana, B.L. & Das, P.K. (1999). Mushroom -- An Alternative Protein Farming, Horticultural Journal, The Agri-Horticultureal Society of India, Alipore, Kolkata-700 027.
19. Jana, B. L. (1999). Mushroom–An Alternative Protein Farming. J. of the Bidhannagar Horl. Soc., June'99, pp. 24-26.
20. Jana, B. L. (2000). Medicinal Value of Mushrooms. J. of the Bidhannagar Hort. Soc., June 200, pp. 38-41.
21. Kohli, M.S. (1992). Mushroom–Struggling in Formative stage. The Hindu Survey of Indian Agriculture, pp 193-197.
22. Kohli, M.S. (1990). Farm from a mushrooming growth. The Hindu Survey of Indian Agriculture, pp 217-219.
23. Kezeli, T.A. and Dzabaridze L.D. (1944). Bull. Acad. Sci. Georgian, SSA (Cited by Gilbert and Bobinson, 1957).
24. Kapoor, J.N. (1989). Mushroom Cultivation, ICAR, New Delhi.
25. Lintzel, W. (1941). The nutritional value of edible mushroom protein, Biochem. Acta. 308:314-419.
26. Mushroom Growers' Association. Press Release, 1994.
27. Mushroom Cultivation. Training Programme on Agricultural Projects by UCO Bank, Bangalore, 1994.
28. Phutela, R.P. and Gupta Urmila (1995). Farm and farming of Straw mushroom (*Volvariella* spp), Indian Farmers' Digest, January 1995, pp. 85-88.
29. Rai, R.D. (1994). Mushroom–Aiming for the World Market. The Hindu Survey of Indian Agriculture, pp. 191-194.
30. Sharma, S.R. and Rai, R.D. (1994). Mushroom : Aiming for the World market. The Hindu Survey of Indian Agriculture, pp. 195-197.
31. Singh, R.P. and Chaube, H.S. (1995). Mushroom farming in U.P. – Scenario and Prospect. Indian Farmers' Digest, January 1995, pp.-85-88.
32. Shukla, H.P. (1995). Feasibility of mushroom cultivation under prevailing temperature condition in Uttar Pradesh. Indian Farmers' Digest, January 1995, pp. 89-91.
33. Singh, R.P. and Chaube, H.S. (1995). Feasibility of Mushroom Production at different attitudes of U.P. Hills. Indian Farmers' Digest, January 1995, pp. 92-93.

34. Singh, R.P. & Chaube, H.S. (1995). Economics of button mushroom cultivation, Indian Farmers' Digest, January 1995, pp. 67-71.
35. মাশরুম বা ছাতুর চাষ—সুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন উপাচার্য, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাশক—শর্মিষ্ঠা রায়, সুবচনী, ২৮, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স, কলকাতা -৭০০ ০১৯।
36. মাশরুম—হরেন দলুই। প্রকাশক—সঞ্জিত কুমার সাহা, SEDP মিডিয়া, ৬৫এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা -৭০০ ০০৯।
37. মাশরুম চাষ একটি কুটির শিল্প—নির্মলেন্দু সামন্ত। গণশক্তি, ১১ই অক্টোবর, ১৯৯৫, কৃষি ও কৃষক বিভাগ, পাঁচ পৃষ্ঠা।
38. মাশরুম বা ছত্রাক চাষ, কৃষি অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
39. মাশরুম—ড. নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, 'বাংলার কৃষি শিল্প' পত্রিকা, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৪।
40. মাশরুমের চাষ—প্রমথেশ মুখোপাধ্যায়, 'তৃতীয় পৃথিবী' পত্রিকা, বর্ষ-৫, সংখ্যা ৫ ও ৬, অক্টোবর, ১৯৯৪।
41. ড. দিলীপ চক্রবর্তী এবং ড. দিনেশ খাটুয়া, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, উদ্ভিদ রোগবিদ্যা বিভাগ, মোহনপুর, নদীয়া (Personal Communications)।
42. মাশরুমের চাষ—গ্রামীণ পরিবেশে সুলভে স্বাস্থ্যকর খাদ্য তৈরি, ২৪ পরগনা বনবিভাগ ও দঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত।

SOME BOOKS ON MUSHROOMS FOR GENERAL READING

1. Modern Mushroom growing–P.J.C. Vedder, Educa book, Culember, Netherlands (1978).
2. Edible Mushrooms & their cultivation – S. T. Chang and P. G. Miles, CRC Press, Florida (1998).
3. Hand Book of Mushrooms – Nita Bahal, Oxford and IBH, New Delhi (1984).
4. A Manual of Mushroom Growing – H. S. Garcha, PAU, Ludhiana (1984).
5. Mushroom Cultivation – J. N. Kapoor, ICAR Pub (1989).
6. Mushroom Growing in India – Brig. Harmandar Singh, Sterling Publishers P. Ltd., New Delhi.
7. The Biology and Cultivation of Edible Mushrooms – S. T. Chang and W. A. Hayers, A. P., New York (1978).
8. Cultivation of white Button Mushroom (*Agaricus bisporus*) – B. Vijay and Yash Gupta. Tech. Bulletin 4, National Centre for Mushroom Research & Training (ICAR), Chambaghat, Solan - 173213, HP, India.

9. The Cultivation of Mushrooms – L.J.LD. Van Griensaven. Darlington Mushroom Laboratories Ltd., Rustington, Succex, England (1988).
10 The Biology & Technology of the Cultivated Mushrooms – P. B. Flegg, D. M. Spencer and D. A. Wood, John Wiley & Sons, New York (1985).
11. Compendium of lectures of Summer Institute on "Recent Developments in the Cultivation Technology of Edible Mushrooms"– NCERT Pub (1990).
12. মাশরুম বা ছাতুর চাষ—সুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন উপাচার্য, বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাশক—শর্মিষ্ঠা রায়, সুবচনী, ২৮, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স, কলকাতা -৭০০ ০১৯ (১৯৯৬)
13. মাশরুম—হরেন দলুই, SEDP, ৬৫এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ (১৯৯৩)।
14. মাশরুম চাষ : একটি গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক পুনরুত্থান সম্ভাবনা—বলাই লাল জানা ও প্রফুল্ল কুমার দাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।